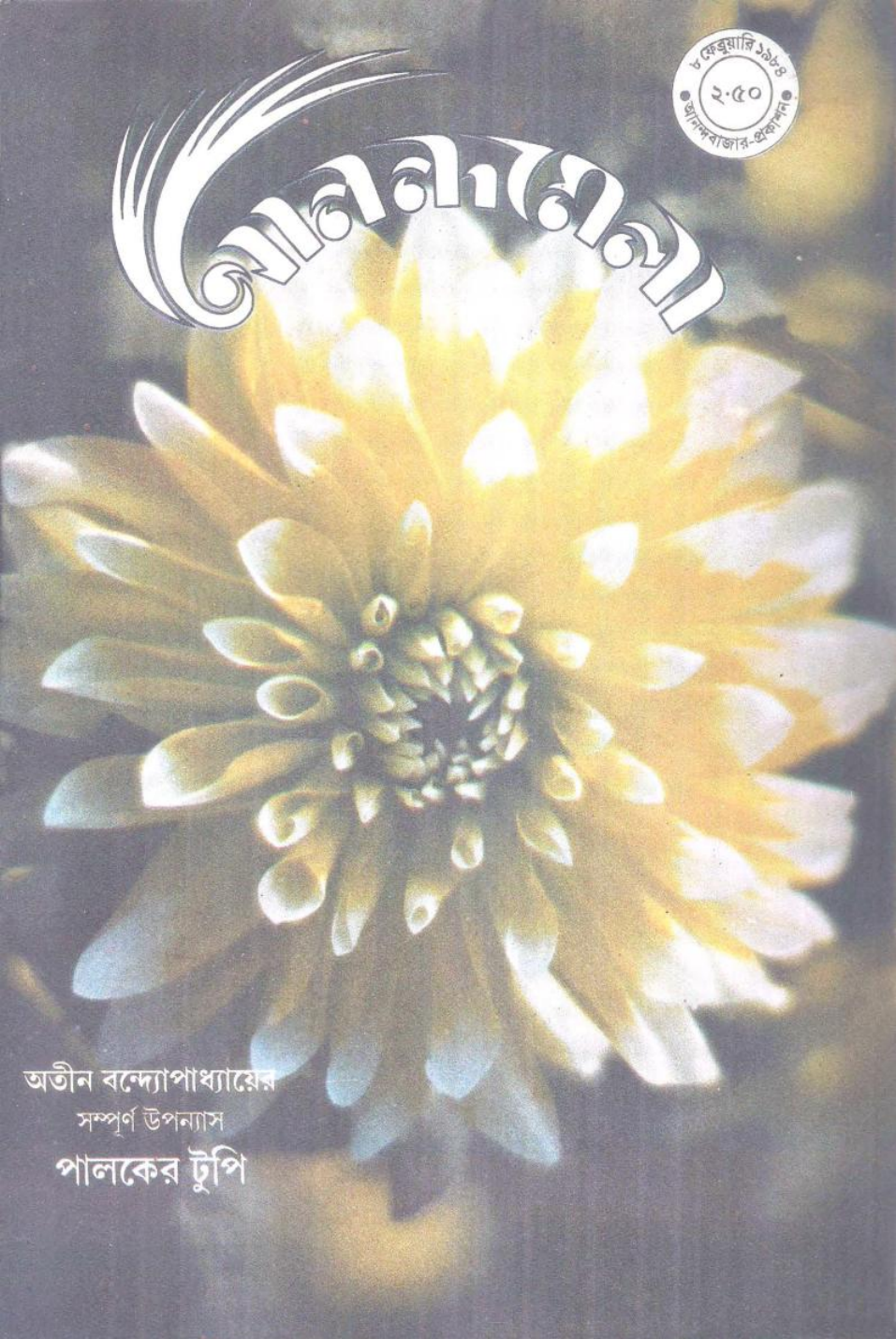

আনন্দমেলা

৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪
২·৫০
আনন্দবাজার-প্রকাশন

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের
সম্পূর্ণ উপন্যাস
পালকের টুপি

Hard Copy - Srikrishna Library
Special Thanks to Somnath Dasgupta
Scan - Ani87
Edit - Optimus Prime

This e-copy is scanned and preserved by
Dhulokhela Team Members

Anyone Can Contribute to our project by
giving their rare magazines for scan.

Reach us at
optifmcybertron@gmail.com

মলটোভা দল–
দুরন্ত...দুর্নিবার, ওদের মতলব আন্দাজ করা ভার!

চন্‌মনে প্রাণ-চাঞ্চল্যে ভরা ... খেলাধুলায় দারুণ স্ফূর্তির ফোয়ারা! এর জন্য বাচ্চাদের চাই-ই-চাই মলটোভা। সোনালী গম, বার্লি, খাঁটি, দুধ, পুষ্টিকর কোকো আর চিনি মিলিয়ে বানানো মলটোভা খেতেও যেমন দারুণ ... যোগায়ও ভরপুর পুষ্টি। আজ থেকেই আপনার বাচ্চাদের মলটোভা দিতে শুরু করুন।

সোনালী রোদে পাকানো সোনা সোনা গম আর বার্লির মল্ট

পাঞ্জাবের সরেস জাতের গম আর বার্লি মিলিয়ে মিশিয়ে মলটোভা প্লান্টে বানানো পুষ্টিকর মল্ট আর তার সঙ্গে শরীরের দরকারি খনিজ পদার্থ ও ভিটামিন B মিলিয়ে যে সহজ-পাচ্য খাদ্যটি তৈরী হ'ল, তা বাচ্চাদের দিনে দিনে সবল স্বাস্থ্যে গড়ে তুলবে।

খাঁটি, পুষ্টিকর দুধ

মলটোভার দুধ আমাদের নিজস্ব দুগ্ধ সংগ্রহ কেন্দ্র থেকে আসে সর্বদাই পুরো ১০০% খাঁটি ও পুষ্টিকর।

দারুণ স্বাদের কোকো

বিদেশ থেকে আনানো সরেস জাতের কোকো দিয়ে মলটোভা বানানো ...যা আপনার বাচ্চাদের খেতেও লাগবে দারুণ আর পাবে সেরা পুষ্টিকর গুণ। কোকো শরীরের ক্লান্তি দূর করে আর আরাম এনে দিতে সাহায্য করে।

চিনি মানে প্রাণ-প্রাচুর্যের খনি

সরেস আখের খাঁটি, সাদা সাদা বড় দানার চিনি দিয়ে মলটোভা বানানো হয়। বাড়ন্ত বাচ্চাদের বাড়তি শক্তির জন্যে এটা খুবই দরকারি।

ভিটামিনের বিশেষ গুণে ভরপুর

মলটোভা হ'ল প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের মিলনে তৈরী এক চমৎকার খাদ্য। এছাড়া, এটি ভিটামিন A, নিয়াসিন, ভিটামিন B_1 ও ভিটামিন D_2-এর বাড়তি গুণেও ভরপুর। আরো কি জানেন, এতে কোনরূপ কৃত্রিম স্বাদ-গন্ধেরও বালাই নেই।

JIL জগৎজিত ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিমিটেড

১৯৮১ ও ১৯৮২ সালে মণ্ড (বিশ্ব) নির্বাচনে স্বর্ণপদক বিজয়ী।

ভিটামিনে ভরপুর মলটোভা: স্বাস্থ্য, শক্তি ও উদ্যমের জন্যে

SIMOES/JIL/3/83 BEN

আনন্দমেলা

সম্পূর্ণ উপন্যাস

পালকের টুপি ৪৮
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

ধারাবাহিক উপন্যাস

কালো পর্দার ওদিকে ১৯
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ভ্রমণকাহিনী

স্মরণীয় সিঙ্গাপুর ৬
অজিতকুমার ঘোষ

গল্প

দুর্বাসা তরু ১৩
রেবন্ত গোস্বামী
স্বপনদার হারানিধি ৩১
রেখা বড়ুয়া
খেলা ৪৪
সুব্রত চট্টরাজ

ছড়া

ধরা ৫
বিমল দত্ত
আরেক রকম ছন্দ ২৬
সুতপা ভট্টাচার্য
দাও রং ২৯
প্রসেনজিৎ গুহঠাকুরতা

খেলাধুলো

নেহরু গোল্ড-কাপ পেল পোল্যাণ্ড ৮৩
শ্যামসুন্দর ঘোষ
বিদায় ক্রিকেট ৮৭
অশোক রায়

কমিক্স, লেখাপড়া, ধাঁধা-মজা, শব্দসন্ধান, তোমাদের পাতা ও অন্যান্য আকর্ষণ

প্রচ্ছদ : অজয় শীল

বিদ্যা-দেবী বিদায় নিয়ে
ওই দ্যাখো যান চলে ;
স্নেহের দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে
কোন্ কথা যান বলে ?
হয়তো বলেন, "বলব কী আর,
সবাই ভাল থেকো ;
খেলার সঙ্গে লেখাপড়ার
দিকেও নজর রেখো ।"

২৫ মাঘ ১৩৯০-৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪-৯ বর্ষ ২২ সংখ্যা

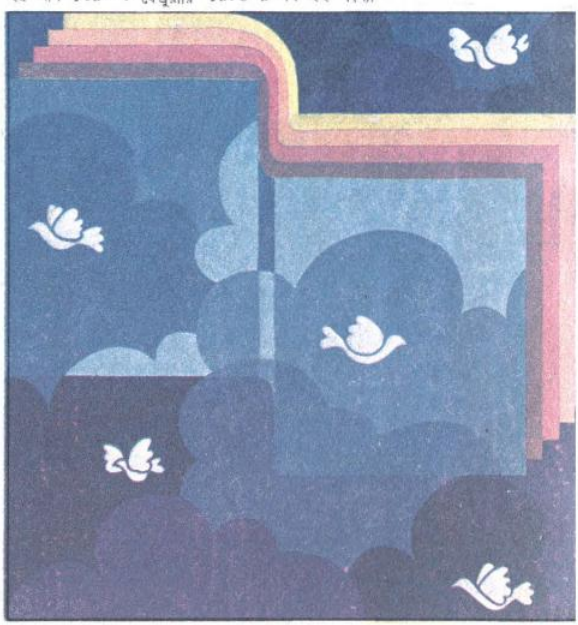

সম্পাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বাপ্পাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮ সি আই টি রোড, কলকাতা ৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত । দাম দু'টাকা পঞ্চাশ পয়সা । বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ১০ পয়সা । উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যে ১৫ পয়সা । পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

নট-আউট

সুইঙ আর কাটার-এর জারিজুরি ফক্কা
গুগ্‌লী বা টপ্‌ স্পিন, সবেতেই ছক্কা!
হুক, পুল, লেট-কাট, মার সব চোস্ত
বোলারেরা কাঁদ-কাঁদ, ফিল্ডার ত্রস্ত
এই ছোটে থার্ড ম্যানে, এই ছোটে কভারে
গেল! গেল! ধর! ধর! ফের চার, বাবারে!
রান বাড়ে যত তার রোদ বাড়ে দশগুণ
মাথা করে ঝিমঝিম, ঘেমে নেয়ে হয় খুন।
সন্ধ্যায় ফেরে সব চেহারা কি অপরূপ!
রোদে পোড়া ঝলসানো, জামা ভিজে চুপচুপ।
নট আউট যে ব্যাট্‌সম্যান হাসিখুশি মূর্তি
সেঞ্চুরী হাঁকড়িয়ে প্রাণভরা ফুর্তি।
একগাল হেসে বলে, এই নিন বোরোলীন
ভাল করে হাতে মুখে এক্ষুনি মেখে নিন।
রোদ-জ্বালা, কাটা-ছড়া সেরে যাবে চটপট।
ফিল্ডিং-এ নামবেন, কাল ফের ঝটপট।

কাটা-ছড়া ও ত্বকের সুরক্ষার জন্য

বোরোলীন

সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম

জি ডি ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড
আশা মহল, নিউ আলিপুর, কলকাতা ৭০০ ০৮৮

HTC-GDP-5242A

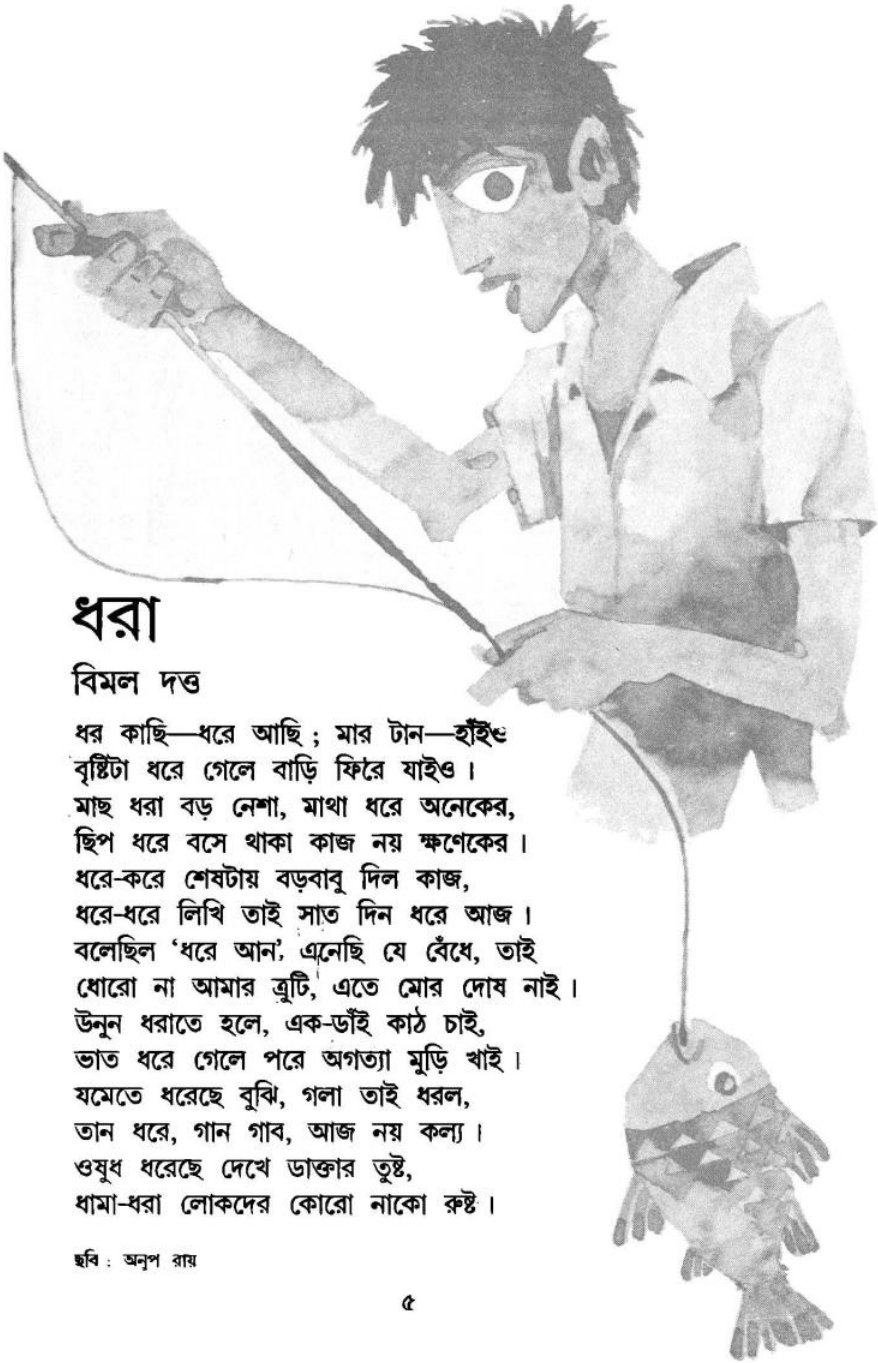

ধরা

বিমল দত্ত

ধর কাছি—ধরে আছি ; মার টান—হাঁইও
বৃষ্টিটা ধরে গেলে বাড়ি ফিরে যাইও।
মাছ ধরা বড় নেশা, মাথা ধরে অনেকের,
ছিপ ধরে বসে থাকা কাজ নয় ক্ষণেকের।
ধরে-করে শেষটায় বড়বাবু দিল কাজ,
ধরে-ধরে লিখি তাই সাত দিন ধরে আজ।
বলেছিল 'ধরে আন', এনেছি যে বেঁধে, তাই
ধোরো না আমার ত্রুটি, এতে মোর দোষ নাই।
উনুন ধরাতে হলে, এক-ডাঁই কাঠ চাই,
ভাত ধরে গেলে পরে অগত্যা মুড়ি খাই।
যমেতে ধরেছে বুঝি, গলা তাই ধরল,
তান ধরে, গান গাব, আজ নয় কল্য।
ওষুধ ধরেছে দেখে ডাক্তার তুষ্ট,
ধামা-ধরা লোকদের কোরো নাকো রুষ্ট।

ছবি : অনুপ রায়

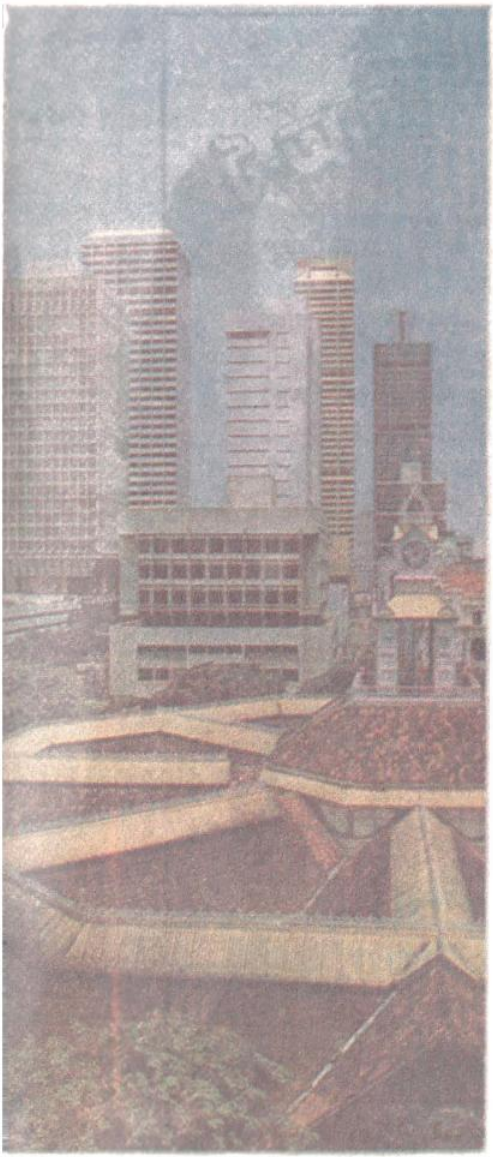

সেরানগুন রোডের আশেপাশে

স্মরণীয় সিঙ্গাপুর

অজিতকুমার ঘোষ

চাঙ্গি বিমানবন্দরে যখন আমাদের বিমানটি এসে পৌঁছাল, তখন দক্ষিণচিন সাগরে সন্ধ্যার কালো ছায়া নেমে এসেছে। কিন্তু অন্ধকারে তারার মতো জ্বলছে বিমানবন্দরের আলোগুলো। ম্যানিলা থেকে সিঙ্গাপুর এয়ারলাইনসের বিমানে আমরা সিঙ্গাপুরে এলাম। বৃহৎ বিমানবন্দর। ভিতরে চারদিকে আলোয় ঝলমল করছে। তকতকে ঝকঝকে আর নতুন রঙে পালিশে উজ্জ্বল সর্বত্র। ইমিগ্রেশান ও কাস্টমসে কোনোই ঝামেলা হল না। ব্যাগেজ ট্রলিতে মালপত্র নিয়ে যখন বিমানবন্দরের বাইরে এলাম তখন দেখলাম আকাশচুম্বী সৌধমালায় শোভিত সিঙ্গাপুর আমাদের অভ্যর্থনায় প্রস্তুত। আলোকমালায় সজ্জিত বিশাল বিমানবন্দরের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম, মাত্র কয়েক বছরে কী অসম্ভব ব্যাপারই না ঘটেছে! ষাট বছর আগেও চাঙ্গি ছিল পাহাড় ও জঙ্গলে ঘেরা জলাভূমি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় চাঙ্গিগ্রাম চিনা, মালয়ি ও ভারতীয়দের বাসভূমি হয়ে উঠল। এখানে কোটি কোটি টাকা খরচ করে যে বিমানবন্দরটি নির্মাণ করা হল, আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে তার গুরুত্ব অনেকখানি।

আমাদের নিয়ে যাবার জন্য শীততাপনিয়ন্ত্রিত বাস অপেক্ষা করছে।

বিমানবন্দর থেকে আমাদের হোটেলের দিকে যাবার সময় রাতের সিঙ্গাপুর শহর দেখতে দেখতে যাচ্ছিলাম। রাস্তাঘাট অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এখানে রাস্তায় কোনো ময়লা আবর্জনা ফেলা দণ্ডনীয় অপরাধ। দু'ধারের সৌধগুলি আকাশ ভেদ করে উঠেছে। বাহান্ন-তলা পর্যন্ত বাড়ি এই শহরে আছে। আধুনিকতম স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন এই বাড়িগুলি শহরটিকে আধুনিক শোভা ও সজ্জায় অপরূপ করে তুলেছে। দোকান, হোটেল, ভোজনশালার অঙ্গসজ্জা, বর্ণবিলাস ও আলোকমালা দৃষ্টিকে সবসময় নন্দিত করে রাখে।

আমাদের বাসের গাইড, সিঙ্গাপুরভ্রমণে আমাদের নিত্যসঙ্গিনী, যেতে যেতে সিঙ্গাপুরের বিচিত্র ইতিহাস আমাদের বলছিলেন। একশো সত্তর বছর আগেও জায়গাটি ছিল জলাজমিতে পরিপূর্ণ। সমুদ্রযাত্রী ও জলদস্যুদের আবাসভূমি ছাড়া এর অপর কোনো পরিচিতি ছিল না। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একজন কর্মী স্ট্যামফোর্ড র‍্যাফেলসের চোখে এই জায়গাটিকে সবুজ গাছপালাশোভিত সমুদ্রবন্দরে রূপায়িত করার স্বপ্ন জেগেছিল। তিনি ভবিষ্যতের পটে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখেছিলেন এই বন্দর টেনে আনবে অনেক বাণিজ্যজীবী, ভাগ্যান্বেষী ও সাম্রাজ্যসংগঠককে। তাঁর এই দূরবর্তী কল্পনা সত্যে পরিণত হল। সিঙ্গাপুরে অনেক লোক আসতে শুরু করল। কাছের ও দূরের লোক, বহু জাতি ও বহু ভাষার লোক। এল চিন, ভারত, আরব ও ইউরোপ থেকে লোকের পর লোক। র‍্যাফেলস বুঝেছিলেন, এই দ্বীপটির উন্নতি করতে হলে এখানকার লোকেদের জানতে হবে, তাদের সঙ্গে

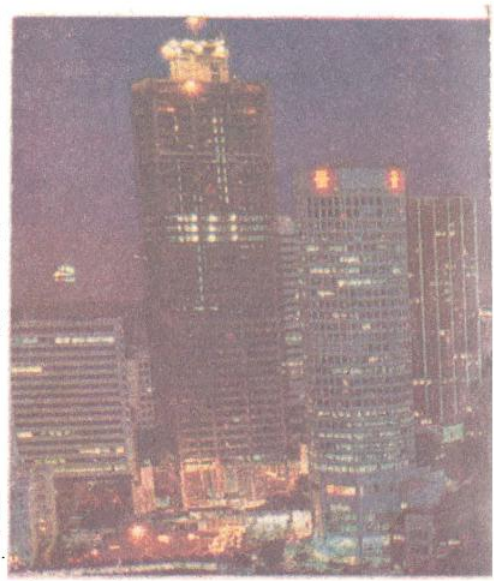

সিঙ্গাপুর (রাত্তিরে যেমন দেখায়)

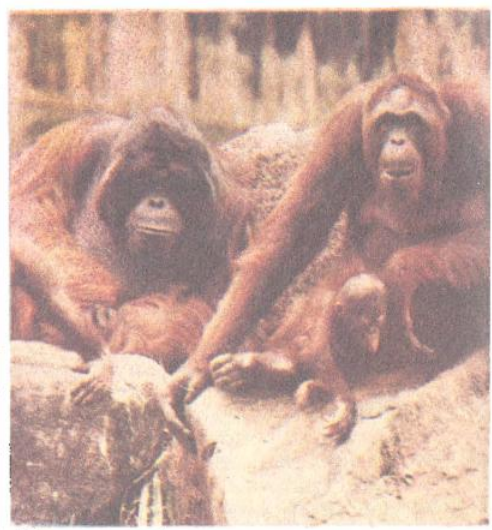

চিড়িয়াখানায় ওরাংওটান

ঘনিষ্ঠ হতে হবে। তিনি মালয়ি ভাষা শিখলেন, স্থানীয় লোকেদের আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করলেন এবং তাদের আপনার করে নিলেন। স্থানীয় লোকেরাও তাঁকে বিশ্বাস করত। ভালবাসত। র‍্যাফেলসের স্বপ্ন আজ সত্যে পরিণত। দক্ষিণচিন সাগরের এই সবুজ দ্বীপটি বাণিজ্যিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সাফল্যের এক উজ্জ্বল নিদর্শন। সিঙ্গাপুর আজ ঐশ্বর্যের স্বর্ণপুরী, মিশ্র সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র এবং সফল রাজনৈতিক শাসনের আদর্শ কেন্দ্র।

আমাদের হোটেল এসে পড়ল। পাঁচতারা হোটেল, হোটেল প্রেসিডেন্ট মার্লিনের জাঁকজমক, বিলাসবাহুল্য এবং বর্ণময় চাকচিক্য চোখ ঝলসে দেয়। রিসেপশানে ঘরের চাবি, পরিচিতি-কার্ড ও ব্রেকফাস্ট কুপন সব তৈরি ছিল। সেগুলি নিয়ে স্বয়ংক্রিয় লিফটে নয়তলার নির্দিষ্ট ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার জিনিসপত্র ঘরে পৌঁছে গেল। জানলার কাচ দিয়ে বাইরের দিকে দৃষ্টিপাত করলাম। অট্টালিকার পর অট্টালিকার সারি। আকাশের জ্বলজ্বলে তারার মতোই অসংখ্য আলো জ্বলছে। ঘরের মধ্যে রঙিন টিভিতে তখন নাচগান, হৈ-হুল্লোড়ের আর অন্ত নেই। শরীর ক্লান্ত, এখন বিশ্রামের প্রয়োজন।

পরের দিন সিঙ্গাপুর ঘুরে দেখার পালা। সিঙ্গাপুর শহরের ভিতরে ও সমুদ্রতীরে সর্বত্র হরেকরকম গাছপালা ও ফুলের সমারোহ। একটি উঁচু জায়গা থেকে দূরে নীল সমুদ্রের বুকে নানা জাহাজের আনাগোনার অপরূপ দৃশ্য দেখা যায়। তীরে ঘন-সারিবদ্ধ গাছের শোভা। নানা ধরনের হস্তশিল্পের প্রদর্শন ও দোকান ভ্রমণকারীদের আকর্ষণ করে। সুদৃশ্য কাজ করা কাপড় অথবা আনারসের পাতা দিয়ে তৈরি হরেক রকমের ব্যাগ তাদের মন ভোলায়। অলঙ্কার, জামাকাপড়, খেলনার প্রচুর আয়োজন। সিঙ্গাপুরের উদ্ভিদ-উদ্যান না দেখলে সিঙ্গাপুর দেখাই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। র‍্যাফেলস লোকেদের দিয়ে গাছ ও ফুলের চারা সংগ্রহ করে এনে এক জায়গায় সযত্নে সেগুলি লাগাতেন। সেই জায়গাটি ক্রমে ক্রমে এক বৃহৎ উদ্যানে পরিণত হল। কতরকম ফুল যে ওই উদ্যানে দেখলাম, তা বলে শেষ করা যায় না। ফুলগুলির আকার, রঙ ও সতেজ প্রাচুর্য মনের মধ্যে এক আশ্চর্য আনন্দ উদ্রেক করে। উদ্যানের মধ্যে সবুজ তৃণাচ্ছাদিত ভূমি ও অতি পরিষ্কার রাস্তা। উদ্ভিদ-উদ্যানের মতো আর একটি দর্শনীয় জায়গা হল জাতীয় জাদুঘর। র‍্যাফেলসের আর একটি নেশা ছিল কীটপতঙ্গ ও নানা প্রাণী সংগ্রহ করা। সেগুলি নিয়েই জাতীয় জাদুঘর গড়ে উঠল। সিঙ্গাপুরের আর একটি প্রধান আকর্ষণ হল তার চিড়িয়াখানা। স্বাভাবিক সিঙ্গাপুরের প্রাকৃতিক পরিবেশে কোনো কৃত্রিম বেড়া কিংবা দেওয়ালের বাধা ছাড়াই নানা ধরনের জীবজন্তু স্বাধীনভাবে এখানে বিচরণ করছে। সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় ওরাংওটানদের এই চিড়িয়াখানাতেই দেখতে পাওয়া যায়। দু' হাজার একরের উপর অবস্থিত এই মজার পশুপাখিদের রাজত্বে যে-কোনো জীবজন্তুর সঙ্গে ভাব জমাতে পারো। হাতির পিঠে চড়ে ঘুরতে পারো, সাহস থাকে তো অজগর সাপ কাঁধে জড়িয়ে ফোটো তোলাতে পারো, কিংবা ওরাংওটানদের সর্দার আহ্‌মেঙ্গের সঙ্গে করমর্দনও করতে পারো।

জাতি, ধর্ম, সংস্কৃতির আদর্শ

মিলনকেন্দ্র হল সিঙ্গাপুর। এখানে চিনা, মালয়ি ও ভারতীয় সকলেই মিলেমিশে পরম শান্তিতে বাস করছে। একদিন এক তামিলভাষী দোকানদার আমাদের বললেন, "এখানে জাতিধর্মের কোনো সমস্যা নেই। আমরা পরম সুখে আছি।" সিঙ্গাপুরের গণতান্ত্রিক শাসনে সকলেই স্বস্তি ও শান্তিতে আছে মনে হল। সাধারণ লোকের মনে সরকারের প্রতি আস্থা অক্ষুণ্ণ। সিঙ্গাপুরের দ্রুত উন্নতির অন্যতম কারণ এটি।

সিঙ্গাপুরে মন্দির, মসজিদ ও গির্জা পাশাপাশি শান্তিতে বিরাজ করছে। সবচেয়ে পুরনো মন্দির হল দেড়শো বছরের শ্রীমারিয়াম্মান মন্দির। মন্দিরের বর্ণময়, কারুকার্যশোভিত চূড়াটি বিশেষ দর্শনীয়। অষ্টভুজা কালিয়াম্মান দেবীর মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল ১৯০৪ সালে। শ্রীবাস পেরুমল মন্দিরটি ১৮৫৫ সালে নির্মিত হয়েছিল, অনেককাল জীর্ণ অবস্থায় ছিল, কয়েক বছর আগে সংস্কার হয়েছে। দীপাবলীতে সিঙ্গাপুরের কিছুটা অংশ যেন সাময়িকভাবে ভারতভূমি হয়ে ওঠে। আলোর মালা, পূজা ও উৎসবের ঘটা, বাঁধভাঙা আনন্দের জোয়ার তখন সিঙ্গাপুরকে মাতিয়ে রাখে।

সিঙ্গাপুরের একটি দর্শনীয় জায়গা হল ক্রান্‌জি যুদ্ধ সমাধিস্থল। গত মহাযুদ্ধের মিত্রসেনাবাহিনীগুলির নিহত অসংখ্য সৈনিককে এখানে সমাধিস্থ করা হয়েছে। তৃণাচ্ছাদিত বিস্তারিত ভূখণ্ডে অসংখ্য প্রস্তরফলক অনাবৃত আকাশের নীচে সৈনিকদের বীরত্ব ও ত্যাগের পরিচয় বহন করছে। স্থানে-স্থানে গুচ্ছ-গুচ্ছ পুষ্পরাজি। চারদিকে এক পরম নীরব প্রশান্তি।

সিঙ্গাপুরের আর একটি মজাদার জায়গা হল শিশু-উদ্যান। সমস্ত উদ্যানটিতে হরেকরকমের জীবজন্তু ও মানুষের মূর্তি স্থাপিত রয়েছে। সব মূর্তিরই কৌতুকজনক ভঙ্গি। মূর্তি ছাড়াও নানারকম চিত্র, নকশা, কৃত্রিম জলাশয়, ফোয়ারা ইত্যাদি নানা জায়গায় স্থাপিত। কিছু কিছু স্থূলত্ব থাকলেও সমস্ত উদ্যানটি শিশুদের মজা ও শিক্ষা দেবার জন্য বহু অর্থব্যয়ে পরিকল্পিত এবং পাথর ও প্লাস্টারের মাধ্যমে রূপায়িত।

হংকং-এর মতো সিঙ্গাপুরও মুক্ত বন্দর। অর্থাৎ, এখানে কোনো কিছু কিনলে ট্যাক্স দিতে হয় না। সেজন্য বিশ্বের যত শৌখিন ক্রেতা ও ধান্দাবাজ স্মাগলারের ভিড় হয় এই দুই জায়গায়। দোকানদারেরাও বিশ্বের বাজার থেকে হরেকরকম লোভনীয় পণ্যদ্রব্য নিয়ে তাদের দোকান সাজিয়েছে। নানা অঞ্চলের ক্রয়-বিক্রয়ের রীতিও নানা ধরনের। অরচার্ড রোডের সাজানো জমকালো দোকানগুলিতে দরদাম করা চলে না। আবার সেরানগুন রোডে দরদাম না করলে এবং দেখে জিনিস না নিলে ঠকবার সম্ভাবনা খুব বেশি। অরচার্ড রোডকে বলা হয় সিঙ্গাপুরের স্নায়ুকেন্দ্র। এই অভিজাত সরণিটি দুপাশের বৃক্ষরাজিতে ছায়াঘন ও স্বপ্নময়। বড় বড় হোটেল ও দোকান এই অঞ্চলকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাসম্পন্ন করে তুলেছে। এখানকার বড় বড় দোকানগুলি চিনাদের দ্বারা পরিচালিত। ঝকঝকে শো-কেস, সুদৃশ্য আসবাবপত্র, সুসজ্জিত আধারে ঠাসা জিনিসপত্র। পাওয়া যায় না এমন কোনো জিনিস এখানে নেই। চামড়ার ব্যাগ, জুতো, সুটকেস, ঘড়ি, রেডিও, ভিডিও সেট, সুগন্ধি দ্রব্যাদি, জুয়েলারি, জামাকাপড়—কী নেই

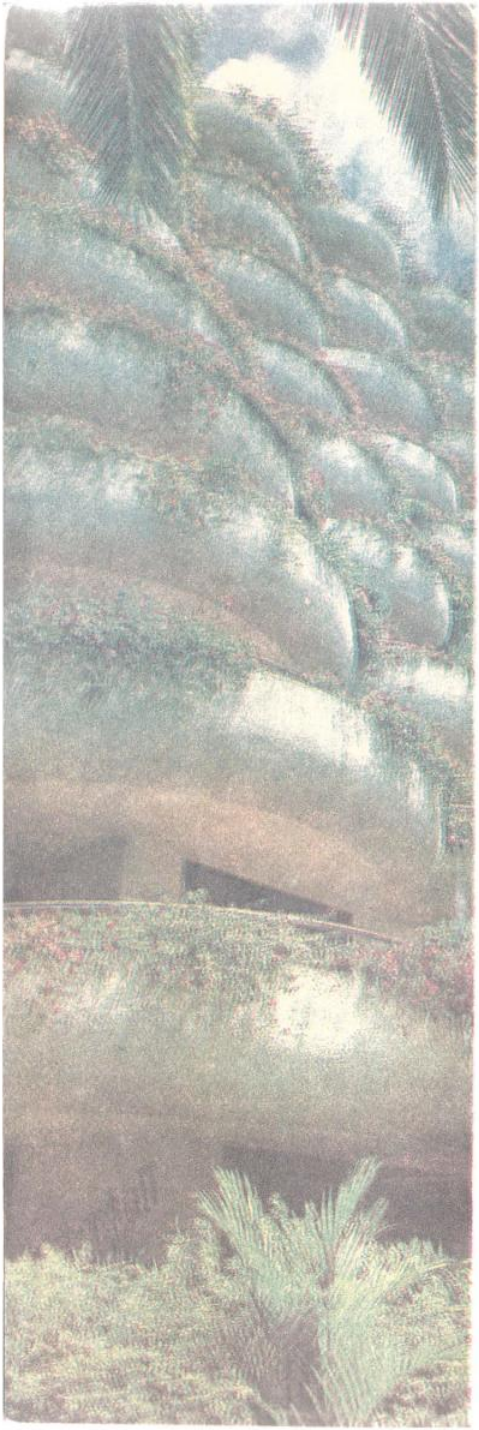

এখানে। দাম এখানে অন্য অঞ্চলের তুলনায় একটু বেশি। মহারাষ্ট্রীয় বন্ধু আওয়াতে ও আমি বেশ কিছুক্ষণ ঘুরলাম এখানে। কিন্তু আমাদের কম দামে কেনার মতো কিছুই পেলাম না। শুধু দেখেই নয়ন সার্থক করতে হল।

সিঙ্গাপুরের ভারতীয় অঞ্চল হল সেরানগুন রোড। ভারতীয় অঞ্চল মানে তামিলভাষী অঞ্চল। আসলে, সিঙ্গাপুরের ভারতীয়দের মধ্যে তামিলই সংখ্যায় অনেক বেশি। এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ছয় ভাগ ভারতীয়। ভারতীয় তামিলরা বর্তমানে এই গণতান্ত্রিক দেশে সবরকম অধিকারই পাচ্ছে, ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকার, রাজনৈতিক অধিকার। তাই তারা খুব সুখী ও স্বচ্ছন্দ। কিন্তু সেরানগুন রোড দিয়ে চলতে চলতে ভাবছিলাম, এখানে আবার শ্রীলঙ্কার মতো সমস্যা কোনো দিন দেখা যাবে না তো ? ভারতীয়রা এখানে ব্যবসা করছে, অনেকেরই দোকান আছে, নিজেদের বাড়িঘরও অনেকে করেছে। ভারতের সঙ্গে ব্যবসাক্ষেত্রে লেনদেনও তাদের নিয়মিত চলে। ভারত ও সিঙ্গাপুরে তাদের যাতায়াতও অবাধ ও নিয়মিত। তারা তাদের সামাজিক আচার-ব্যবহার ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান নিশ্চিন্ত মনে পালন করে চলেছে। সেরানগুন রোডে চলবার সময় মনে হয় তামিলনাড়ুর কোনো অঞ্চল দিয়েই হাঁটছি। মেয়েদের খোঁপায় ফুল, ছেলেরা লুঙ্গির মতো করে কাপড় পরে আবার হাঁটুর কাছে উলটিয়ে দিয়েছে। দক্ষিণ ভারতীয় হোটেলও কয়েকটি রয়েছে। বড়া, ইডলি, দোসার ঢালাও ব্যবস্থা। ভাতের সঙ্গে ঘি, তরকারি, ডাল, সম্বরম্, রসম্ ইত্যাদি।

অরচার্ড রোডের ধারে

কমলাবিলাস হোটেল এরকম একটি হোটেল, দু'বেলায় সেখানে ভারতীয়দের ভিড়। আমি এই হোটেলটিতে প্রায়ই খেতে যেতাম। রকমারি শাড়ি ও নানা ভারতীয় মুখ দেখে মনে হত না যে, আমরা ভারতের বাইরে আছি। সেরানগুন রোডে নানা মসলার গন্ধে বাতাস হয়ে উঠেছে ঝাঁঝালো। আবার রাস্তার ধারে ফুলের স্তবক ও মালা বিক্রি হচ্ছে। তবে ভারতীয় অঞ্চল বলেই তত বোধহয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয়। ছেঁড়া কাগজ, ঠোঙা, পাতা, বাসী ফুল, ফলের খোসা, ধুলোবালির কিছুটা সঞ্চয় এখানে চোখে পড়ে। অর্থাৎ সিঙ্গাপুরের অন্য অঞ্চলের মতো তকতকে ঝকঝকে নয়। সেরানগুন রোডের ভারতীয় দোকানগুলি জিনিসপত্রে ঠাসা। ব্যাগ, সুটকেস, ছাতা, ক্যামেরা, ট্র্যানজিসটার, ঘড়ি, ক্যাসেট কত কী। সেগুলি আমদানি করা হয়েছে জাপান, হংকং, তাইওয়ান প্রভৃতি দেশ থেকে। দাম খুবই সস্তা। তবে হ্যাঁ, দরাদরি করতে হবে। আর দেখে নিতে হবে যাতে বাজে জিনিস দিয়ে না ঠকায়। দেখলে সবই কিনতে ইচ্ছে করে, কিন্তু কাস্টমসের ভয়। তবুও কিছু কিনলাম। হোটেলে ফিরে এসে ক্লান্ত শরীরটি বিছানায় এলিয়ে দিলাম। রেডিওতে কিছুক্ষণ গান শুনলাম। টিভিতে চার চ্যানেলে চারটি ভাষায় প্রোগ্রাম চলছে। ইংরেজি, চিনা, মালয়ি ও তামিল—এই চার ভাষার সমান মর্যাদা। কাচের ভিতর দিয়েই বাইরের দিকে চোখে পড়ল, আকাশচুম্বী অট্টালিকাগুলি আলোয় ঝলমল করছে। কাল স্বদেশের দিকে যাত্রা। কত জায়গা দেখলাম, কত মানুষ! দেখার তো শেষ নেই!

অরচার্ড রোড, সিঙ্গাপুর

GJA: 1154 Ben

ফুল যেমন ওঠে ফুটে অপূর্ব সৌন্দর্য্যে ভরিয়ে, আপনার রঙের বাহারও তেমনি ধীরে ধীরে উঠবে ফুটে, সৌন্দর্য্যের চমক লাগিয়ে!

আপনার সৌন্দর্যে চমক জাগান, স্বাভাবিক উপায়ে — ল্যাকটো-ক্যালামাইন দিয়ে। আপনার রঙ, উজ্জ্বল দীপ্তিময় ও নিখুঁত ক'রে তোলার জন্যেই এটির প্রয়োজন। ঔষধিযুক্ত ক্যালামাইন আপনার ত্বককে সুরক্ষিত রাখে, ত্বকের যত্ন নেয় — এর ময়েশ্চারাইজার রাখে ত্বককে শিশির-কোমল ও তরতাজা করে — আর এর অ্যাস্ট্রিঞ্জেন্ট, মুখের ত্বককে টানো টানো শোভাময় ও প্রাণবন্ত ক'রে রাখে। তাই তো, আপনার মত শোভাময়ী সুন্দরীরা, বছরের পর বছর ধরে ল্যাকটো-ক্যালামাইনএর ওপরই ভরসা ক'রে থাকেন।

তিনটি সাইজে পাওয়া যায়।

CROOKES
Lacto-Calamine
ক্যালামাইন • ময়েশ্চারাইজার • অ্যাস্ট্রিঞ্জেন্ট
রঙের বাহার সম্পূর্ণভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্যে

দুর্বাসা তরু

রেবন্ত গোস্বামী

মাথাটা ঘুরে উঠতেই ধপ্ করে মাটিতে বসে পড়লেন অজিতবাবু। কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন তিনি। কতটা এই হঠাৎ অসুস্থতার দরুন, আর কতটাই বা বিস্ময়ের ধাক্কায় তিনি এইভাবে থাকলেন, তা হয়তো নিজেও জানেন না। অবাক হয়ে ভাবেন, তবে কি তাঁর বন্ধু কৃষ্ণন নামবিয়ার যা বলেছিল, সেটা সত্যি—নেহাত কথার কথা নয়? তাঁর বাড়ির লোকেরও একটা সংস্কার দানা বেঁধেছে এ-ব্যাপারে। কাক ওড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাল দু-একবার পড়তেই পারে। কিন্তু প্রতিবারই যদি পড়ে, তখন তার মধ্যে একটা কার্যকারণ সম্পর্ক থাকাটাই স্বাভাবিক। তিনি ঠিক করে ফেললেন, আজ বিকেলেই যাবেন তাঁর পরিচিত বটানির অধ্যাপক বিনয়বাবুর সঙ্গে দেখা করতে। তিনি নিশ্চয় বলতে পারবেন, ব্যাপারটার মধ্যে কোনো বিজ্ঞানসম্মত কারণ আছে— না, শুধুই মনের ধারণামাত্র।

সেদিন দুপুরে গৌহাটি থেকে ভাইপোর টেলিগ্রামে দাদার গুরুতর অসুখের সংবাদ পেয়ে আরো ভয় পেয়ে গেলেন তিনি। তবে কি সবই এই দুর্বাসা তরুর অভিশাপের ফল? দাদার এই অবস্থায় তাকে দু-একদিনের মধ্যেই গৌহাটি রওনা হতে হবে। হাজরার মোড়ে রেলের টিকিট করার অফিস আছে। সেখান থেকে টিকিট কেটে একেবারে প্রফেসর বিনয় দেবের সঙ্গে দেখা করেই আসবেন—অজিতবাবু ভাবলেন। বিনয়বাবু ওখানেই থাকেন।

এই ফাঁকে অজিতবাবুর কথা কিছু বলা যাক। অজিতমোহন রায় একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী। অফিসের কাজে তিনি ভারতের নানা জায়গায় থেকেছেন। বর্তমানে কলকাতায় বদলি হয়ে এসে শহরতলিতে নিজের বাড়িটাতে আছেন। তিনি যখন কুইলনে ছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় কৃষ্ণন নামবিয়ারের। পরিচয় থেকে বন্ধুত্ব। কৃষি বিভাগে কাজ করতেন নামবিয়ার। কিন্তু তাঁর আর এক পরিচয়—সেটা তিনি নিজেই বলতেন—তিনি ছিলেন প্রকৃতিপরায়ণ। নামবিয়ার বলতেন, বিজ্ঞানের বলে হঠকারিতা করে কিছু করলে মানুষ নিজেরই বিপদ ডেকে আনবে। বিজ্ঞান মানুষকে অসীম শক্তিতে বলীয়ান হওয়ার বর দিলেও হিরণ্যকশিপুর বা রাবণের বরের মতো তাতে একটা বিরাট ফাঁক আছে। কেরলের সাইলেন্ট ভ্যালির নিবিড় অরণ্যের অনেকখানি ধ্বংস করে যখন সেখানে বিরাট এক জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তখন নামবিয়ার প্রবল প্রতিবাদ করলেন। তারপরই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন তিনি। আর সেরে উঠলেন না। অজিতবাবুর মনে হয়েছিল, তিনি যেন আত্মাহুতি দিয়ে প্রকৃতিকে বাঁচানোর শেষ চেষ্টা করলেন।

মারা যাওয়ার কয়েকদিন আগে নামবিয়ার অজিতবাবুকে এই গাছের ছোট্ট চারাটা দিয়ে বলেছিলেন, 'এটা আমার সৃষ্ট প্রকৃতি রক্ষীবাহিনীর একজন সৈন্য। একে যত্ন করবেন, এ আপনাদের সুখশান্তির বর দেবে। কিন্তু সাবধান, দুর্ব্যবহার কিন্তু সইবে না। তখন আপনাকে ভোগাবে।

এখন ভেবে দেখুন, নেবেন কি না।'

তখন এটাকে ঠাট্টা মনে করেই অজিতবাবু চারাটাকে নিয়ে এসেছিলেন। কোয়ার্টার্সের বাগানে লাগিয়ে যত্নও করেছিলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই প্রমোশন পেয়ে যখন কলকাতায় বদলি হয়ে এলেন, তখন বন্ধুর স্মৃতি মনে করে গাছটাকেও নিয়ে এসে বাড়ির ছোট্ট বাগানটাতে জানলার ধারে পুঁতলেন।

এরপরেই একের পর এক কয়েকটি ঘটনায় নামবিয়ারের সতর্কবাণী মনে পড়ল তাঁর। প্রথম দু-একবার অত গুরুত্ব দেননি। যেমন, এখানে এসেই প্রথম দিন তাঁর স্ত্রী ঘরদোর পরিষ্কার করে ময়লাগুলো জানলা দিয়ে গাছটির ওপর ছুঁড়ে ফেলে দেন। সেদিনই বঁটিতে হাত কাটল তার। অজিতবাবু তখন ঠাট্টা করে বলেছিলেন,"বোঝো'এখন'ঠ্যালা—কর্মের ফল। গাছ বলে কি সে [illegible]

এরপরের ঘটনাটা একটু গুরুতর। বাড়ি চুনকাম করতে এসে একজন মিস্ত্রি বালতির চুনজলের কিছুটা গাছটার ওপর ঢেলেছিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে মই থেকে পা হড়কে পড়ে গিয়ে হাত ভাঙল। তখন আবার তাকে নিয়ে হাসপাতালে ছোটা—সে এক হেনস্থা।

তাঁর চাকর ভোলা একদিন গরম জল ছুঁড়ে ফেলল গাছটার পাতার ওপর। তারপর পেছন ফিরে এক পা যেতেই পিছলে পড়ে কপাল কাটল।

অজিতবাবু তখনও বিশ্বাস করেননি যে এগুলো গাছটির অভিসম্পাতের ফল। কিন্তু তাঁর স্ত্রী বিশ্বাস করে তুলসীগাছের মতো পুজোই করতে লাগলেন গাছটার। আর গাছটিও লাই পেয়ে বেশ বেড়ে উঠল। কলকাতায় এসে নিজের বাগান

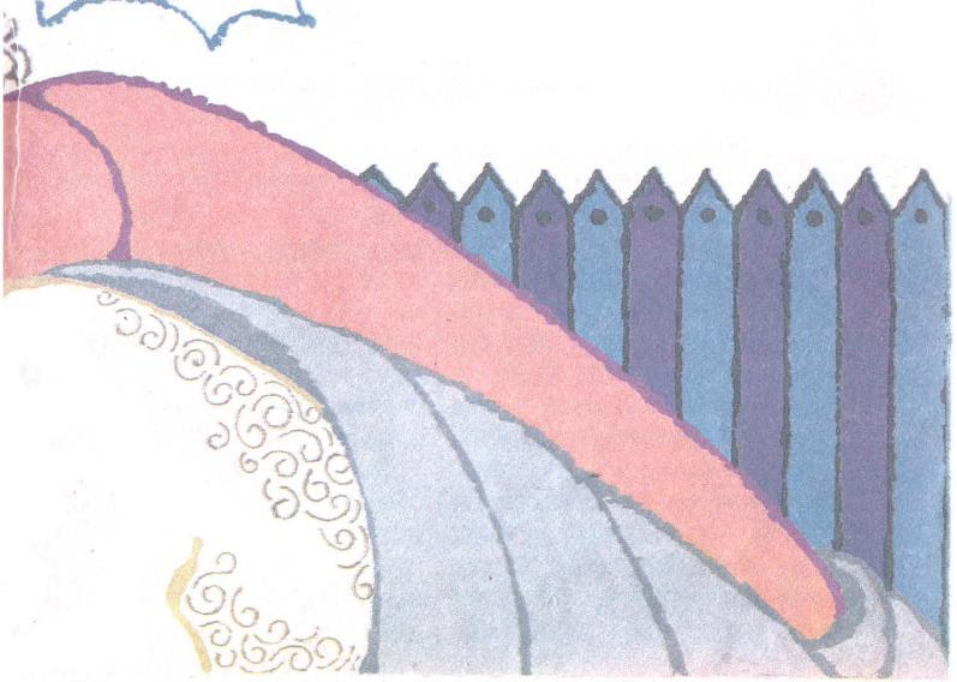

নিয়ে ব্যস্ত থাকার জন্যেই কি না কে জানে, তাঁর স্ত্রীর পুরনো হাঁটুর বাতের ব্যথাটাও এখন আর নেই।

তাঁর ছেলে শান্তুর আবার দুর্বাসামুনির ওপর খুব রাগ। তার মা গাছটাকে প্রায়ই দুর্বাসা গাছ বলায় সে একদিন লুকিয়ে তার খেলার বাঁশের তরোয়াল দিয়ে গাছটার গুঁড়িতে পেটাতে লাগল খুব করে। একটু পরেই তার আর্ত চিৎকারে অজিতবাবু আর তাঁর স্ত্রী ছুটে এসে দেখেন, রক্তারক্তি কাণ্ড। বাঁশের ছুঁচলো আগায় শান্তুর পায়ের অনেকখানি চিরে গিয়েছে।

তারপরে তাঁর স্ত্রীর মতন গাছটির তোয়াজ না করলেও তিনি আর ওটাকে ঘাঁটাতেন না। শান্তু ভোলা এদেরও বারণ করে দিয়েছিলেন।

আজ এতদিন পরে গাছটার একটা ডাল জানলার দিকে অনেকটা এগিয়ে আসতে দেখে তাঁর কী খেয়াল হল—ভাবলেন, কেটে দেবেন। যে কোনো গাছ হলেই হয়তো তা করতেন। কিন্তু এবারের ইচ্ছের মধ্যে যেন একটা পরীক্ষা করার লোভ উঁকি দিয়েছিল। দেখাই যাক না ফলটা কী হয়।

ফলটা পেলেন সঙ্গে সঙ্গেই। ডালে কোপ মারতেই মাথাটা ঘুরে উঠল আর সেই মাথা ধরা চলল সারাদিন সারা রাত। স্ত্রীকে আর বললেন না কথাটা। তাঁর মনে পড়ল, নামবিয়ারের বাগানে এই গাছ তো অনেকগুলো ছিল। নামবিয়ার বলেছিল, এই গাছের ফুল ফল হয় না। গাছটি মরে গেলেই তার আর কোনো বংশ থাকবে না। নামবিয়ার কি অরণ্যকে রক্ষা করতে এই গাছ বনের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিল ? কোথায় পেল সে এই গাছ ?

সে বলেছিল বটে, নিজের সৃষ্টি। কিন্তু গাছ তো আর যন্ত্রপাতি নয় যে, কলকব্জা জুড়ে তৈরি করবে। এ বিষয়ে হয়ত বিনয়বাবু বলতে পারবেন।

হঠাৎ অজিতবাবুর মনে হল, নামবিয়ার কি এই গাছের ওপর কোনো দুর্ব্যবহার করেছিল শেষ দিকে? নইলে হঠাৎ ওভাবে সে মারা গেল কেন?

বিনয়বাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল সেদিনই। সব শুনে বিনয়বাবু হো-হো করে অনেকক্ষণ হাসলেন। তারপর বললেন, "অজিতবাবু, এর চেয়ে যদি বলতেন আপনার বাগানে একটা মানুষখেকো গাছ আছে, তাহলে হয়তো বিশ্বাস করলেও করতে পারতাম। হ্যাঁ—প্রত্যেক প্রাণীর মতো গাছেরও আত্মরক্ষার জন্যে প্রকৃতির অনেক ব্যবস্থা আছে। গায়ে কাঁটা বা শুঁয়ো, পাতায় তেতো স্বাদ বা অনিষ্টকর রস—এইসব গাছকে গোরু-ছাগলের হাত থেকে বাঁচায়। অবশ্য মানুষের কাছে ওসব কোনো প্রতিরোধই নয়। তাই বলে, গাছ দুর্বাসা মুনির মতন অভিশাপ দেয়, বা শিবের মতন বর দেয়—এসব কথা ঐ সব আষাঢ়ে গল্প-লেখকদের বলুন, কাজে দেবে। আরে মশাই, একজন মানুষের ক্ষতি করেই আরেকজন মানুষ কত বহাল তবিয়তে ঘুরছে। যাদের ক্ষতি হচ্ছে, তারা কিছু করতে পারছে? আর এ তো একটা গাছ মাত্র। যাই হোক, আমার কলেজে তো ছুটি চলছে। কাল সকালেই আপনার বাড়ি গিয়ে সেই তরুদেবতাকে দেখে আসব।"

পরদিন সকালে বিনয়বাবু সত্যিই এলেন এক ঘণ্টা বাস ঠেঙিয়ে। অজিতবাবু মাথার যন্ত্রণায় আর দাদার চিন্তায় তখনও বেশ কাহিল। বিনয়বাবু এসে বললেন, "দেখি আপনার গাছ।" কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকালেন গাছটার দিকে। তারপর বললেন, "কোথা থেকে আপনার বন্ধু গাছটা সংগ্রহ করলেন বলতে পারেন? গাছটার ব্যাপারে দেখতে হবে। পাতাগুলো দেখেছেন? আকাশিয়া আরাবিকা বা বাবলার মতন। অথচ ডালে কাঁটা নেই। কাণ্ডটা আবার ফাইকাস ইলাসটিকার মতন। কোথায় কোপ মেরেছিলেন, দেখি। একটা সবুজ রঙের সিক্রেশন বেরিয়ে জমে আছে দেখছি। সত্যিই স্ট্রেঞ্জ!"

বিনয়বাবুর বলা নামগুলো অজিতবাবুর কাছে হোমিওপ্যাথি ওষুধের নামের মতোই খটোমটো লাগল। তিনি যখন বললেন, গাছটার কোনো ফুল-ফল হয় না আর গাছটা মরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার বংশও বিলুপ্ত হয়, তখন বিনয়বাবু আগের দিনের মতোই হো-হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, "এই গাছটা তবে কি ব্রহ্মার কমণ্ডলুর জলের ছিটেয় জন্মেছিল?"

হঠাৎ একটা কাণ্ড করলেন বিনয়বাবু। শান্তুকে একটা পুরনো খবরের কাগজ আনতে বললেন। কাগজ আনা হলে সেটা গাছের সেই আহত ডালে পেঁচিয়ে নিজের লাইটার দিয়ে কাগজটা জ্বালিয়ে দিলেন। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল।

তাই দেখে অজিতবাবু প্রায় আর্তনাদ করে ছুটে এসে ধাক্কা দিয়ে বিনয়বাবুর হাতটা সরিয়ে দিলেন। লাইটার ছিটকে মাটিতে পড়ল। অজিতবাবু নিজের হাতেই দ্রুত জ্বলন্ত কাগজটা খুলে ফেলে প্রায় হাঁপাতে লাগলেন।

তাঁর কাণ্ড দেখে বিনয়বাবু হাসলেন। তারপর লাইটারটা কুড়িয়ে নিয়ে বললেন,

"নাঃ, সত্যিই আপনার মনটা দুর্বল হয়ে পড়েছে। ওসব উদ্ভট চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলুন তো। অনেক লোক হাতে-গলায়-কোমরে একগাদা মাদুলি কবচ ঝুলিয়েও তো ধুঁকছে। কই, আপনার হাতে তো কিছু নেই। আপনি কি খারাপ আছেন? সবই মনের ব্যাপার।"

অনেক উপদেশ দিয়ে বিনয়বাবু এক সময় চলে গেলেন। তাঁর চলে যাওয়ার পরই অজিতবাবু হঠাৎ অবাক হয়ে অনুভব করলেন, তাঁর মাথা ধরাটা এখন আর নেই। সেদিনই আরেকটা বিস্ময় তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিল। সন্ধেবেলা ঘরে টেলিফোন বেজে উঠতেই তিনি ধরলেন। গৌহাটি থেকে ট্রাঙ্ক কল। শুনে তাঁর বুকটা ধড়াস করে উঠল। কিন্তু বিস্ময়ে আর আনন্দে অভিভূত হয়ে শুনলেন তাঁর দাদারই গলা। তিনি ভালই আছেন। ডাক্তার বলেছে, পেটের থেকেই হয়েছিল। হার্ট থেকে নয়। আজ সকালেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন। তাই ভাইকে হন্তদন্ত হয়ে রওনা হতে বারণ করে দিলেন।

অজিতবাবু ভাবেন, এটাও কি আশুতোষ বৃক্ষের আশীর্বাদ?

পরদিন সকালে আবার হাজরায় এলেন টিকিট ক্যানসেল করতে। কাজ হয়ে গেলে ভাবলেন, একবার বিনয়বাবুর সঙ্গে দেখা করে আসি। তাঁকে ঘটনাটা বলতে হবে। এটাও কি কাকতালীয়?

শেষ বিস্ময়টা তাঁর জন্যে এখানেই বোধহয় জমা ছিল। বাইরের ঘরে কয়েকজন ভদ্রলোক বসে আছেন—কিন্তু কারো মুখে কথা নেই। অজিতবাবুকে দেখে তাঁরা চোখ তুলে চাইলেন। বিনয়বাবুর কথা জিজ্ঞেস করতে সবাই যেন অবাক হলেন। তারপর একজন ধীরে ধীরে যা বললেন, তা হল—তিনি কি খবর শোনেননি? কাল রাত্রে সিগারেট মুখে দিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন বিনয়বাবু। সিগারেটটা চাদরে পড়ে আগুন ধরায়। চাদর থেকে বিনয়বাবুর পোশাকে। বিনয়বাবুর এখন হাসপাতালে এখন-তখন হবস্থা।

কিছুক্ষণ পরে বজ্রাহতের মতো বাস-রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন অজিতবাবু। এখন হাসপাতালে দেখা করতে দেবে না। তবুও তাঁকে যেতে হবে। খবরটা অন্তত পাবেন। একটা অপরাধবোধ তাঁকে খোঁচা দিতে থাকল। তাঁর জন্যেই তো বিনয়বাবুর ওপর গিয়ে পড়ল ঐ ভয়ঙ্কর গাছের অভিশাপ।

একটু দূরে পার্কের মধ্যে কাজ হচ্ছে। মাটির তলায় রেল চলবে, তার তোড়জোড়। এই পাশে একটা ছোট্ট ভাস্কর্য ছিল। মা আদর করে দুহাতে বাচ্চাকে তুলে ধরেছে ওপরে। বাচ্চাটাও তার হাত দুটো বাড়িয়ে মায়ের কোলে নামার চেষ্টা করছে। লোহালক্কড়ের আঘাতে এখন মা আর শিশু দুজনের দেহ থেকেই প্লাস্টারের মাংস খসে পড়ে লোহার শিকের কংকাল বেরিয়ে পড়ছে। খুব খারাপ লাগল অজিতবাবুর।

হঠাৎ দেখলেন, একজন শ্রমিক কোদালের কোপে নির্মূল করতে লাগল একটা সুন্দর সবুজ কুঞ্জলতার ঝোপ। চোখের সামনে যেন একটা খুন দেখছেন—অজিতবাবু এমন ভাবে অস্ফুট একটা আর্তনাদ করে চোখ বুজে ফেললেন।

বাসটাও সেই মুহূর্তে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল।

ছবি : জয়ন্ত ঘোষ

ফ্ল্যাশ গর্ডন

প্রাসাদে কথা হচ্ছে ডেলের সঙ্গে অরার ...
আমার বোকামির জন্যেই সবাই বিপদে পড়েছ তোমরা। আমি দুঃখিত, ডেল।
এক শর্তে আমি রানি হতে রাজি হয়েছি। জারকভ ও বারিনকে মুক্তি দিতে হবে।
বাবা কিন্তু কথা দিয়েও কথা রাখে না।
আসুন, বিয়ের লগ্ন হয়েছে।
তাহলে যাই, অরা।
দেখা যাক!
(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

কালো পর্দার ওদিকে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে : দিপুর বাবা একটা মিনিবাস দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন। সেই অবস্থায় তিনি চোখ বুজলেই দেখতে পান দিপুর জ্যাঠামশাইও খুব অসুস্থ। দিপুর জ্যাঠামশাই থাকেন বর্ধমানের এক গ্রামে। অনেক দিন তাঁর চিঠিপত্র নেই। তাঁর খবর আনতে যেতে হবে। কিন্তু কে যাবে ?

॥ ২ ॥

অমিত ভোর-রাতে উঠে পড়তে বসেছে। দিপুও বেশ তাড়াতাড়ি উঠে দাঁত-টাঁত মেজে স্টেশনে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিল, এমন সময় ঐ খবরটা এল।

অমিত হাতের বইটা ধপাস করে টেবিলের ওপর ফেলে বলল, "চুলোয় যাক পরীক্ষা ! চল দিপু, আমিই যাব তোর সঙ্গে।"

ঝট করে উঠে দাঁড়িয়ে অমিত জামা পরতে শুরু করল। তার ভুরু দুটো কুঁচকে গেছে। মুখে একটা কান্না-কান্না ভাব।

দিপু কাছে এসে ফিসফিস করে বলল, "তোমাকে যেতে হবে না। আমি একলাই যেতে পারব।"

অমিত বলল, "নাঃ ! আমারও মনটা ভাল লাগছে না। প্রায় এক মাস বাবার চিঠি পাইনি। এই পরীক্ষাটা না দিলে তিনটে মাস নষ্ট হবে, তাতে আর কী করা যাবে !"

দিপু বলল, "মনে করো তুমি বর্ধমানে গেলে, তারপর গিয়ে দেখলে যে, জ্যাঠামশাই ভাল আছেন, তখন তোমার কী মনে হবে ? পরীক্ষাটা শুধু শুধু নষ্ট হবে !"

এই সময় মা ঘরে ঢুকে বললেন, "কম্পাউণ্ডারবাবুর ভাই তো এল না ! তা হলে কে যাবে দিপুর সঙ্গে ?"

অমিত বলল, "আমিই যাব ঠিক করেছি !"

মা বললেন, "তুই যাবি ? পাগল নাকি ? তুই মন দিয়ে পড়াশুনো কর্ তো ! আমি দেখছি, আর কাকে দিপুর সঙ্গে পাঠানো যায় !"

অমিত বলল, "না, কাকিমা, আমি মন ঠিক করে ফেলেছি। আর কারুকে খুঁজতে হবে না।"

মা বললেন, "রঘুকে ভবানীপুরে পাঠাচ্ছি, বাবলুকে ডেকে আনবে, বাবলু যাবে দিপুকে নিয়ে। নাহয় বাবলুর একদিন-দু'দিন অফিস কামাই হবে !"

দিপু বলল, "ছোটমামা তো এই মাস থেকে দুর্গাপুরে ট্রান্সফার হয়ে গেছে, তোমার মনে নেই মা ?"

মা বললেন, "ও, তাই তো ! ভুলেই গিয়েছিলুম।"

ইরানি কখন এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়েছে। সে এবার বলল, "একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে তোমরা এমন কাণ্ড করছ কেন বলো তো ? আমি তো বলেইছি, আমি যাব জ্যাঠামশাইয়ের খবর

আনতে। গত বছর আমি শান্তিনিকেতন গেলুম না ? আমাকে একা যদি ছাড়তে না চাও, দিপু চলুক আমার সঙ্গে !"

এরপর বেশ কিছুক্ষণ ধরে আলোচনা চলল। মা কিছুতেই ইরানিকে যেতে দিতে চান না। ইরানি জেদ ধরেছে, সে যাবেই। অমিত বলছে, কারুরই যাবার দরকার নেই, সে একা ঘুরে আসবে।

শেষ পর্যন্ত বাবার কাছে যাওয়া হল। বাবা আজ সকালে বেশ ভালই আছেন। আশ্চর্য ব্যাপার, বাবা কিন্তু ইরানির যাওয়া সম্পর্কে কোনো আপত্তি জানালেন না। তিনি বললেন, "অমিতের পরীক্ষা নষ্ট করবার কোনো মানে হয় না। ইরানি আর দিপুই ঘুরে আসুক। আজকালকার মেয়েরা প্লেন চালাচ্ছে, রকেটে করে স্পেসে ঘুরে আসছে, আর ইরানি সামান্য বর্ধমান ঘুরে আসতে পারবে না ? শোন্, তোরা গিয়ে আজই ফেরার চেষ্টা করিস না। রাত্তিরটা ওখানেই থেকে যাবি। কাল সকালে আবার ট্রেনে চাপবি। ওখানে দয়ালবন্ধু আছে, কাশেমভাই আছে, থাকার কোনো অসুবিধে হবে না। আর যদি দেখিস দাদা সত্যিই খুব অসুস্থ, তা হলে দাদাকে সঙ্গে নিয়ে আসবি। কিংবা যদি মনে করিস, দু' একদিন থেকে যাওয়া দরকার, তাও থেকে যেতে পারিস। আমাদের টেলিগ্রাম করে খবর দিবি।"

ইরানি সঙ্গে সঙ্গে একটা ব্যাগে জামাকাপড় গুছিয়ে ফেলল। মা অবশ্য শুধু ইরানি আর দিপুকে ছাড়লেন না, সঙ্গে দিয়ে দিলেন রঘুকে। রঘুর বয়েস পনেরো, সে দিপুর থেকে খানিকটা বড় আর ইরানির থেকে একটু ছোট।

অমিত বুঝিয়ে দিল ট্রেন থেকে নেমে কোথায় বাস ধরতে হবে আর কোথায় নামতে হবে।

মা বলেছিলেন ট্যাক্সি নিতে। কিন্তু বাড়ি থেকে বেরিয়েই ইরানি বলল, "বাজে পয়সা খরচ করবার কোনো মানে হয় না। আমরা মিনিবাসে যাব।"

সকাল সাড়ে-আটটা বাজে। এর মধ্যেই অফিস-যাত্রীদের ভিড় শুরু হয়ে গেছে। ওরা লাইন দিয়ে মিনিবাসে উঠল।

হাওড়া স্টেশনে এসে ওরা প্রথমে একটু দিশাহারা হয়ে গেল। এত বড় স্টেশন, কোথায় টিকিট কাটার জায়গা ? যেখানে সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিটঘর,

সেখানে অনেকগুলো কাউন্টার। মেমারির টিকিট কোন্‌টা থেকে পাওয়া যাবে ? প্রত্যেক কাউন্টারের মাথায় অনেক জায়গার নাম লেখা। ইরানি আর দিপু সেই নামগুলোর মধ্যে মেমারি নামটা খুঁজতে লাগল।

রঘু বলল, "ও দিদিমণি, লোক্যাল টেরেনের টিকিট কোথায় পাওয়া যায় আমি জানি। আমি তো বড়মামার সঙ্গে দেশে যাই। ঐদিকে তার টিকিট পাওয়া যায়।"

ইরানি বলল, "তোদের দেশ তো মেদিনীপুরে। আমরা কি সেদিকে যাচ্ছি নাকি ! আমরা তো যাচ্ছি বর্ধমানের দিকে।"

দিপু বলল, "বর্ধমানে মোটেই লোক্যাল ট্রেন যায় না। বর্ধমান তো অনেক দূর।"

রঘু তবু জোর দিয়ে বলল, "হ্যাঁ, যায়। বধ্‌ধোমানে লোক্যাল টেরেন যায় !"

রঘু প্রায় ওদের জোর করেই নিয়ে গেল অন্য দিকে। দেখা গেল, রঘু ওদের চেয়ে অনেক কিছু বেশি জানে। সত্যি সেখানে মেমারির টিকিট পাওয়া যাচ্ছে। খুব কাছাকাছি সময়ের মধ্যে দুটো ট্রেন আছে। যে-কোনো একটাতেই যাওয়া যায়।

হ্যাণ্ডব্যাগ খুলে টিকিটের টাকা বার করতে গিয়ে ইরানি থমকে গেল।

পাশ ফিরে দিপুকে জিজ্ঞেস করল, "রঘুকে সঙ্গে নিয়ে যাবার কোনো দরকার আছে ? বাড়িতে মাকে একা-একা সব কাজ করতে হবে। রঘু আমাদের সঙ্গে গিয়েই বা কী সাহায্য করবে ? রঘু বরং বাড়ি ফিরে যাক। তুই কী বলিস ?"

দিপু মাথা নেড়ে দিদির কথায় সায় দিল।

রঘু কিন্তু বেঁকে বসল। সে ফিরে যাবে না। মা তাকে সঙ্গে যেতে বলে দিয়েছেন, এখন সে একলা ফিরে গেলে মায়ের কাছে বকুনি খাবে।

ইরানির মুখে একটু বিরক্ত-বিরক্ত ভাব। রঘুর মতন একটা বাচ্চা ছেলেকে যে তাদের সঙ্গে পাহারাদার করে পাঠানো হয়েছে, সেটা তার পছন্দ হচ্ছে না।

অনেক বলেও রঘুকে বোঝানো গেল না। অগত্যা রঘুর টিকিট কাটতেই হল।

একটা ট্রেন তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মে, একটা ট্রেন সাত নম্বরে। সাত নম্বরেরটাই

আগে ছাড়বে। ওরা গিয়ে দেখল, সেই ট্রেনে বেশ ভিড়, কোনো কামরাতেই জায়গা নেই, এর মধ্যেই লোকে দাঁড়িয়ে আছে।

রঘু বলল, "দিদিমণি, অন্য টেরেনটায় চলো ! আমার বড়মামা বলেছে, পর পর দুটো টেরেন থাকলে পরেরটাতে যেতে হয়। বসবার জায়গা পাওয়া যায়।"

ইরানি বলল, "চল, দেখি গিয়ে।"

ওরা যেই ফিরতে যাচ্ছে, সেই সময় খাকি প্যান্ট আর সাদা গেঞ্জি পরা একটা লোক দিপুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তোমরা কোথায় যাবে ভাই ?"

দিপু বলল, "মেমারি !"

লোকটি ব্যস্ত হয়ে বলল, "তোমরা অন্য দিকে যাচ্ছ কেন ? এই তো, এই ট্রেন মেমারিতে থামবে, উঠে পড়ো উঠে পড়ো !"

দিপু দিদির দিকে তাকাতেই ইরানি কঠোরভাবে বলল, "না, আমরা একটু পরে যাব !"

তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে ইরানি বলল, "আজেবাজে লোক কেউ কিছু বললে গ্রাহ্য করবি না দিপু। তুই ঐ লোকটাকে কেন বললি আমরা মেমারি যাচ্ছি ?"

দিপু বলল, "কেন, বললে কী হয়েছে ?"

ইরানি বলল, "যদি পাজি লোক হয় ? যদি আমাদের ফলো করে ? ঐ লোকটাকে দেখলেই বোঝা যায় ও পাজি লোক।"

দিপু বলল, "দেখলেই বোঝা যায় ? আমি তো বুঝলুম না। তুমি কী করে বুঝলে ?"

ইরানি বলল, "খাকি প্যান্টের সঙ্গে যারা হলদে গেঞ্জি পরে, তারা কখনো ভাল লোক হতে পারে না !"

দিপু ফিক করে হেসে ফেলল। সে জানে, তার দিদি পোশাকের ব্যাপারে খুব পিটপিটে। আর যারা খুব বেশি পান খায়, তাদেরও দিদি দেখতে পারে না। ঐ খাকি প্যান্ট পরা লোকটার দাঁতে লাল লাল ছোপ।

তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মের গাড়িটাতেও বেশ ভিড়। এতেও অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে।

দিপু বলল, "তা হলে তো ঐ ট্রেনটাতেই আমরা গেলে পারতুম। আগে আগে পৌঁছে যেতুম !"

ইরানি বলল, "এটাতেও দাঁড়িয়ে যেতে হবে ? কী বিচ্ছিরি ! ট্রেনে জানলার ধারে না বসলে আমার একটুও ভাল লাগে না !"

দিপু বলল, "চলো দিদি, আমরা ঐ ট্রেনটাতেই যাই। এখানে শুধু শুধু দাঁড়িয়ে থেকে কী হবে ?"

ইরানি বলল, "চল তা হলে !"

ওরা আবার যেই সাত নম্বর প্ল্যাটফর্মের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে, অমনি সেই ট্রেনটা ছেড়ে দিল।

দিপু দৌড়ে সেদিকে যাবার চেষ্টা করতেই ইরানি তার হাত চেপে ধরে বলল, "নাঃ। ওরকম ভাবে চলন্ত ট্রেনে উঠতে নেই। আর একটা ট্রেন তো আছেই ?"

রঘু বলল, "চলো দিদিমণি, যদি ওটাও হঠাৎ ছেড়ে দেয়।"

ওরা এবার জোরে পা চালাল তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মের দিকে। হঠাৎ দিপু মুখ ফিরিয়ে দেখল ওদের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে সেই খাকি প্যান্ট আর হলদে গেঞ্জি পরা লোকটা। (ক্রমশ)

ছবি : প্রদীপ রায়

"এবারের ধাঁধাটা দেখতে বড়, কিন্তু কঠিন নয় মোটেও।" ছোট্‌কা ধাঁধার খাতার পাতা খুলে সামনে রেখে দিল। তারপর কাঁচ মুছে চশমাটা পরতে-পরতে বলল, "শুধু একটু মন দিয়ে আর সময় দিয়ে সময় ভাগ করে দেওয়া।"

ধাঁধাটা লিখতে গিয়ে আমারও মনে হল, তেমন কঠিন ব্যাপার নয়। তবে কিনা, উত্তরটা আমার এখনো হয়নি। তোমরা কে কতক্ষণে সমাধান করতে পারো, দ্যাখো।

প্রথম ধাঁধা ॥ চার বন্ধু। যতীন, দিবাকর, ফণী ও আদিনাথ।

এক কারখানায় পাহারাদারের কাজ করে চারজনে। সেই সূত্রে বন্ধুত্ব। তবে এখন বন্ধুত্ব খুব নিবিড়। প্রত্যেকে প্রত্যেকের সুবিধে-অসুবিধে দেখে। সাহায্য করে।

এদের কাজের সময় হল, রোজ বারো ঘণ্টা। তবে দুটো ভাগে বা শিফ্‌টে। এক-এক শিফ্‌টে এক-একজন ছ-ঘণ্টা করে কাজ করে। কয়েক ঘণ্টা বিশ্রামের পর দ্বিতীয় শিফ্‌ট। রাত্রিদিন মিলিয়ে ২৪ ঘণ্টাই কাজ এদের। পাহারার কাজ তো।

এদের মধ্যে অন্তত দুজনকে একসঙ্গে পাহারার কাজে থাকতে হয়। যে-কোনো দুজন হলেই হল। আর-একটা ব্যাপার হল, সবাই যে একসঙ্গে শিফ্‌ট শুরু করবে তা নয়। আগে-পরে কাজ শুরু বা শেষ করা যায়। তবে একসঙ্গে যেন দুজন অন্তত পাহারার কাজে থাকে, সেটা দেখতে হয় বইকি। ঘণ্টা ধরে এক-একটা শিফ্‌ট শুরু। ঘণ্টার হিসেবে শেষ।

কাজের সময়ের ব্যাপারে চার বন্ধুর চার রকম পছন্দ। যেমন, যতীন। সে প্রথম শিফ্‌ট শুরু করতে চায় মাঝরাতে। মানে রাত বারোটায়। আবার বিকেল চারটের পর সে থাকবে না। দিবাকর সকাল দশটার পর থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত কাজ করতে অনিচ্ছুক। দিবাকরের রাত্রির শিফ্‌ট যখন শেষ হবে, তখন থেকে তার নিজের শিফ্‌ট শুরু করতে চায় ফণী। আদিনাথের আবার অন্য ঝামেলা। রোজ সকাল নটার সময় তাকে কাজে থাকতেই হবে। কেননা, ওই সময় রোজ মালিক এসে তার সঙ্গে দেখা করবেন। কিছু-না-কিছু নির্দেশ দেবেন। আদিনাথকেই দেবেন।

এদের নিজেদের দরকার, ইচ্ছে এবং চাকরির অন্যান্য শর্ত অনুযায়ী সব কিছু বজায় রেখে কীভাবে কাজের সময় ভাগ করে নিতে পারে চার বন্ধু, বলতে পারো ?

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ জট ছাড়াও—

সাদানগর

তৃতীয় ধাঁধা ॥ পরবর্তী দুটি সংখ্যা কী-কী হতে পারে ?

৯, ৩৬, ৮১, ১৪৪, ?, ?

গতবারের উত্তর ॥ (১) ১০টি গোরু। (২) ৬৫, ১২৯। (৩) ন্যায়পরায়ণতা।

সত্যসন্ধ

শব্দ-সন্ধান

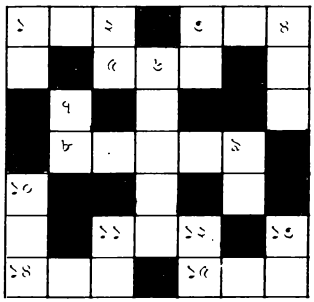

সংকেত : পাশাপাশি : (১) লাগাম। (৩) শজারু। (৫) তর্কাতর্কি। (৮) বিখ্যাত সংস্কৃত নাটক। (১১) শস্যাদি মাপবার পাত্রবিশেষ। (১৪) জাহাজে বা নৌকোয় থাকে। (১৫) আতশবাজিবিশেষ।

উপর-নীচ : (১) আগুন। (২) কোন্ ফলের কষ নৌকোয় লাগানো হয়? (৩) কোন্ ফল স্যালাডে লাগে? (৪) মহাভারতের এক দুরাত্মা-চরিত্র। (৬) ব্রহ্মা। (৭) পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে কার পরাজয় ঘটেছিল? (৯) বন্ধু। (১০) ভারতের একটি রাজ্যের রাজধানী। (১১) বংশ। (১২) জ্যোতিষশাস্ত্রে গ্রহবিশেষ। (১৩) লিকলিকে দুটি হাত, কখনো-বা তিন, তাই দিয়ে মেপে চলে রাত্রি ও দিন।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

গ	ম্বু	জ	■	প	ল্ল	ব
র	■	মা	স্য	ল	■	ল্ল
জ	জ	■	র	■	জা	ম
■	টা	ল	বা	হা	না	■
বা	য়ু	■	হা	■	লা	ভা
গি	■	চ	র	কা	■	র্গ
চা	র্বা	ক	■	রা	ভী	ব

মজার খেলা

এ-খেলাটা খেলা যায় অনেকে মিলে। কতজন তা নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। তবে জন্মদিনের সমাবেশে, পিকনিকের আড্ডায়, ছুটির সন্ধ্যায় সবাইকে নিয়ে দারুণ মজার খেলা।

এর জন্য একটু প্রস্তুতি দরকার। কুড়িটা চেনা জিনিস এক জায়গায় জড়ো করতে হবে। খুব ছোট জিনিস না নেওয়াই ভাল। কী নেবে? যেমন ধরো, কালির শিশি, আয়না, মোজা, চশমা, আলু, কলা, পিনকুশন, বই (একটা)। এই রকম কুড়িটা জিনিস এক জায়গায় জড়ো করতে হবে। কী-কী রাখলে তার একটা তালিকা তুমি আগেভাগে করে নেবে। লিস্টটা পকেটে লুকিয়ে রাখবে।

যারা এ-খেলায় যোগ দেবে, তারা প্রথমে মিনিট তিনেক ধরে সবগুলো জিনিস ভাল করে দেখে নেবে। চোখের দেখা। লেখা চলবে না। তারপর তারা অন্য ঘরে বা দূরে চলে যাবে। এবার এর থেকে একটা জিনিস তুমি কাউকে না দেখিয়ে লুকিয়ে ফেলবে। মানে, ওখান থেকে সরিয়ে ফেলবে। এরপর সবাইকে আরেকবার ডাকতে হবে। জিনিসগুলোকে আরেকবার দেখে প্রত্যেকে মনে-মনে আঁচ করার চেষ্টা করবে, কোন্ জিনিসটা ছিল, কিন্তু এখন নেই। কেউ মুখে বলবে না, কাগজে লিখে তোমার হাতে জমা দেবে। তুমি সেই কাগজগুলো নিয়ে এবার দ্যাখো, কে ঠিক ঠিক লিখতে পেরেছে। যে পারবে, সেই পরের বার খেলাটা খেলাবে। দু-একটা নতুন জিনিসও সে যোগ করতে পারে পরেরবারে। দেখবে, খেলাটা কেমন জমে যাবে।

মজারু

কিসের ফোটো

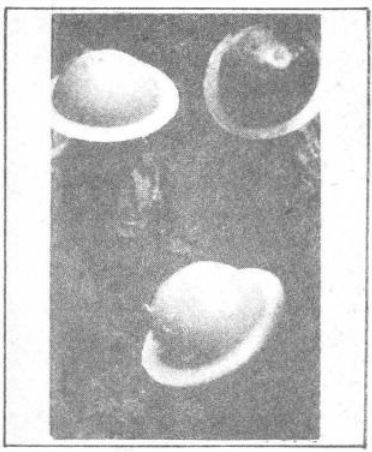

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যায় ছিল প্যারাসুটের ফোটো

ফোটো : তপন দাশ

উত্তর বটে

প্রঃ স্বামীর মাথার চুল স্মৃতি হিসেবে লকেটের মধ্যে রেখেছেন, উনি কতদিন আগে মারা গেছেন ?

উঃ দূর ! উনি মারা যাবেন কোন্ দুঃখে, ওঁর চুলগুলো সব উঠে গেছে।

প্রঃ জলই জীবন—এ কথাটার অর্থ বুঝিয়ে বলতে পারো ?

উঃ পারি স্যার, বন্যা হলে অনেক জীবনের হানি হয়।

প্রঃ কুকুরের জিবটা সব সময়ই বেরিয়ে থাকে কেন বলতে পারেন ?

উঃ লেজের সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যে।

প্রঃ জানো, আমি কলেজে পোলভল্টে চ্যাম্পিয়ন ছিলাম ?

উঃ নর্থ পোল না সাউথ ?

সুসেন

হাসিখুশি

"আমার ভাইকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। খবরটা আপনাদের কাগজে ছাপতে কত খরচ পড়বে বলুন তো ?"

"প্রতি ইঞ্চি কুড়ি টাকা ?"

"সর্বনাশ ! আমার ভাই যে সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা !"

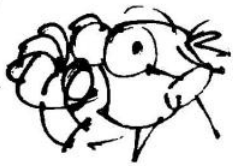

খবরের কাগজের বার্তা-সম্পাদক ফোন ধরলেন। ওপার থেকে শোনা গেল হুঙ্কার, "মশাই, কী কাণ্ড বলুন তো ! আজকের কাগজে ছেপেছেন যে, আমি মারা গেছি !"

"তাই নাকি ! তা আপনি এখন কোত্থেকে কথা বলছেন ?"

●

নববর্ষের সকালে একমাত্র ভাইপোর হাতে একটি বিমাপত্র দিয়ে জ্যাঠামশাই বললেন, "এই নাও রমেশ, আমার পঞ্চাশ হাজার টাকার লাইফ ইনসিওর। আমার কিছু ঘটলে সমস্তই তোমার হবে।"

"এবার থেকে তাহলে যখন-তখন ডাক্তার দেখানো বন্ধ করে দিন। ওতে বৃথাই পয়সা খরচ হয়।" ভাইপোর উত্তর।

"কালু তার ডান হাতের পাঁচটা আঙুল কীভাবে খোয়াল ?"

"নতুন কেনা ঘোড়ার কটা দাঁত উঠেছে দেখতে যেই না ঘোড়ার মুখের মধ্যে হাত ঢুকিয়েছে, অমনি ঘোড়াটাও কালুর হাতে কটা আঙুল আছে দেখতে মুখ বন্ধ করে দিয়েছিল।"

ছবি : অহিভূষণ মালিক

আরেক রকম ছন্দ

সুতপা ভট্টাচার্য

বললে সেদিন আহ্লাদেতে হর্ষকুমার সরকার,
বর্ষা এল, এবার ঠিকই সর্ষে-ইলিশ দরকার।

বন্ধু বলে, ভির্মি খাবে শুনতে পেলে দাম তার
বাড়ল ক'গুণ বুঝবে যদি ভুলবে হিসেব নামতার।

সন্ধেবেলার অন্ধকারে গলছে সরু মোমটা,
ঘামছে শহর বাতাস বিনা মাথায় মেঘের ঘোমটা।

বিমর্ষ-মন হর্ষ ভাবে মেঘ কেন না গর্জায়,
আসতে গিয়ে বর্ষা কেন দাঁড়িয়ে গেল দরজায়!

বন্ধু বলে, বর্ষা এলে আমাদের আর সুখ কী
ফর্সা জামায় লাগবে কাদা হাজার রকম ঝক্কি।

জল-জলময় ধর্মতলা, জলের তলায় গর্ত
মচকাল পা মাসতুতো ভাই, এক পা গেলে মরত।

তর্ক করে হর্ষ তবু—এমন কী আর মন্দ
এই শহরে বেঁচে থাকার আরেক রকম ছন্দ।

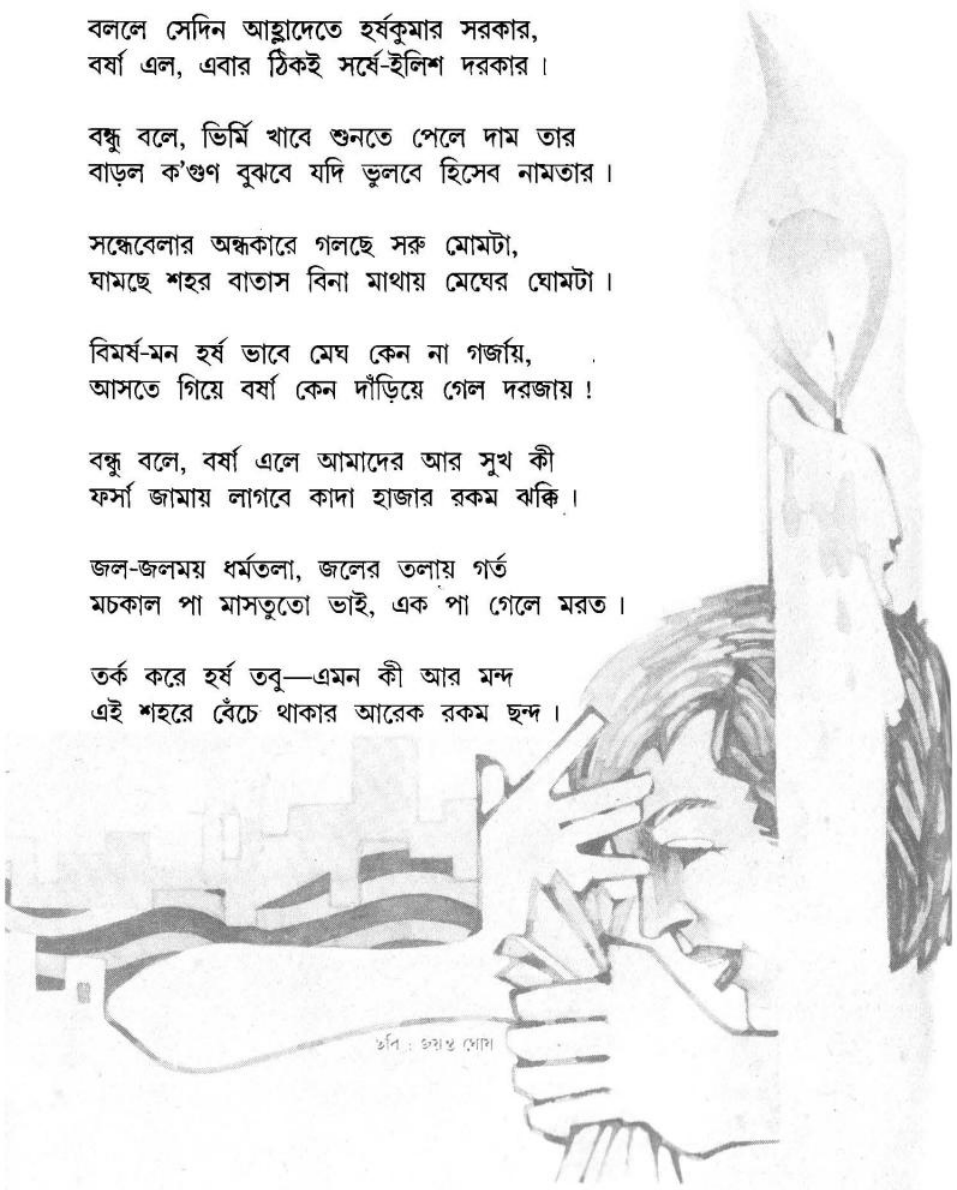

ছবি : জয়ন্ত ঘোষ

ব্যাটে-বলে

পঙ্কজ রায়

॥ ১৩ ॥

ফ্রাংক ওরেলের জন্য তাঁর সহযোদ্ধারা হাসিমুখে বোধহয় প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারতেন। আজ অবধি ফ্রাংকের বিরুদ্ধে কথা বলেছে এমন একজন ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানকেও আমি দেখিনি। অমন একজন ক্যাপ্টেন তো বটেই, অমন সতীর্থ পাওয়াও মহা ভাগ্যের কথা। ফ্রাংকি দলে থাকলে কেউ গোমড়া মুখে থাকে না। প্রত্যেকের মেজাজ শরিফ। কারণ, ফ্রাংকি কারও হাঁড়িপানা মুখ দেখতে মোটেই পছন্দ করেন না। এই দুটো মজার কথা বলছেন, এই আবার হা-হা করে হাসছেন। রস-রসিকতা, ঠাট্টা-গল্প, জমিয়ে রাখতে ওরেল অদ্বিতীয়। বাকি কেউ ভারী মুখে থাকতে পারেন না।

অথচ সময়মতো এই মানুষটিই এমন রাশভারী হয়ে উঠতে পারতেন যে, ঘনিষ্ঠজনরাও তাঁর কাছে ঘেঁষতে রীতিমত ভয় পেতেন। তিনি গম্ভীর হলে সকলে তটস্থ হয়ে ভাবতেন— হ্যাঁ, বড় একটা গোলমাল হয়েছে অথবা কোনো কিছুর অসামঞ্জস্য বিব্রত করছে এই সদাহাস্যময় লোকটিকে। প্রত্যেকে সেই অসামঞ্জস্য দূর করার জন্য তৎক্ষণাৎ ব্যস্ত হয়ে পড়তেন।

বিশ্ববিশ্রুত অল-রাউণ্ডার গ্যারি সোবার্স খুব একগুঁয়ে লোক ছিলেন। ১৯৬৬-৬৭ সালে ইডেনে দ্বিতীয় দিনে মারাত্মক ব্যাপারের পর সোবার্স গোঁ ধরে বসলেন, তিনি আর মাঠে নামবেন না। নানাজনে নানাভাবে তাঁকে বোঝালেন। কিন্তু নিজের সিদ্ধান্তে সোবার্স অনড়। ওদিকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ মাঠে না নামলে খেলা ভেস্তে যায়। ওরেল তখন কলকাতায় খেলা দেখতে এসেছিলেন। কলকাতার একজন সাংবাদিক ওরেলকে অনুরোধ করলেন, তিনি যদি একবার সোবার্সকে মাঠে নামতে বলেন। ওরেল সোবার্সকে একবার বলামাত্রই রাজি হয়ে গেলেন সোবার্স। ওরেলের কথা অমান্য করার সাহস তাঁর ছিল না। ফ্রাংক ওরেল বলেছেন, এটুকুই যথেষ্ট। সোবার্স মত পালটে মাঠে নামলেন।

কিন্তু এই পাহাড়প্রমাণ শ্রদ্ধা তৈরি হয় কীভাবে ? লেস্টার কিং কলকাতায় একটা ছোট্ট ঘটনার কথা উল্লেখ করেছিলেন। কিং অভিভূতকণ্ঠে বলেছেন, ওরেলের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা এই ঘটনার পর থেকে অনেক বেড়ে গিয়েছিল। তাঁকে দেবতার মতো ভক্তি করতেন কিং।

১৯৬১-৬২ সালে ভারত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফর করেছিল। সফরের প্রথম টেস্টে অধিনায়কত্ব করেছিলেন নরি কনট্রাকটর। দ্বিতীয় টেস্টের আগে বারবাডোজের বিরুদ্ধে খেলায় গ্রিফিথের বলে মারাত্মকভাবে জখম হন নরি। ফলে তাঁর জায়গায় অভিষেক হল মাত্র একুশ বছর বয়সী পতৌদির। সিরিজে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের নেতৃত্ব করেছিলেন ফ্রাংক ওরেল। নরির

জরুরি অস্ত্রোপচারের জন্য রক্তের প্রয়োজন হলে সবার আগে এগিয়ে এসেছিলেন এই মহান মানুষ—ওরেল।

সেই সিরিজে প্রত্যেকটি টেস্টের আগে কিং ভীষণভাবে আশা করেছিলেন তিনি চূড়ান্ত একাদশে জায়গা পাবেন। প্রথম টেস্টের পর, ওয়াটসনের দায়িত্ব বর্তাল চার্লি স্টেয়ার্সের ঘাড়ে। স্টেয়ার্স বিশেষ সাফল্যলাভ না করার ফলে কিংয়ের আশা উত্তরোত্তর জোরদার হচ্ছিল। ত্রিনিদাদে চতুর্থ টেস্টেও দলে আসার সুযোগ না পেয়ে ভেঙে পড়লেন কিং। ভাবলেন, এই মরসুমে বোধহয় তাঁর আর কোনো আশা নেই।

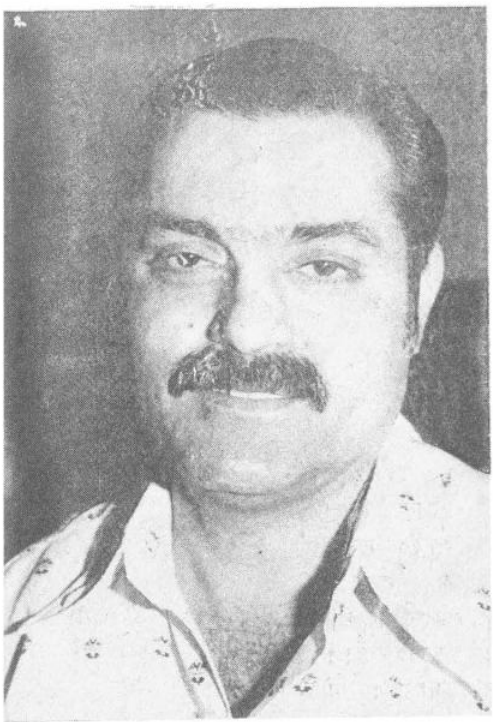

নরি কনট্রাকটর (এখন)

পরের টেস্ট জামাইকাতে। শেষ টেস্ট। সম্পূর্ণভাবে নিরাশ হয়ে পড়েছেন তরুণ কিং। টেস্ট শুরু হওয়ার আগের দিন রাতে অপ্রত্যাশিতভাবে সশরীরে ওরেল হাজির হলেন কিংয়ের কাছে। কিং বিস্মিত হয়ে ভাবলেন, ব্যাপার কী! একেবারে খোদ ক্যাপ্টেন তাঁর কাছে হাজির! ঘরে ঢুকেই ওরেল জানালেন একটি অতি সুসংবাদ—'জামাইকা টেস্টে তুমি খেলছ।'

কিং আনন্দে আত্মহারা। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল এক বিপত্তির কথা। তাঁর জামাকাপড়, মোজা, বুট— কিছুই পরিষ্কার নেই। নৈরাশ্য কিংকে এতখানি ঘিরে ধরেছিল যে, তিনি ধরেই নিয়েছিলেন জামাইকাতেও দলে ঠাঁই পাওয়া যাবে না। অতএব জামাকাপড় ধোয়ানো বা বুট পরিষ্কার রাখার ব্যাপারে তিনি কোনো তাগিদ অনুভব করেননি। সর্বনাশ! এবার কী হবে? রাত পোয়ালেই ম্যাচ। কী করে তিনি খেলবেন?

ময়লা জামাপ্যান্ট আর অপরিষ্কার জুতো পরে তো আর টেস্ট ম্যাচ খেলতে নামা যায় না। তবে কী···। মহা ফ্যাসাদ। ভীষণ ভাবনায় পড়লেন লেস্টার কিং।

কিংয়ের মুখে চিন্তার ছায়া স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল। অধিনায়ক ওরেল তা লক্ষ করেছিলেন। কী হয়েছে, জিজ্ঞেস করতেই কিং খোলাখুলি বলে ফেললেন সমস্যাটা। "কাল সকালেই খেলা। আমার জামাপ্যান্ট, বুট, মোজা, কিচ্ছু পরিষ্কার নেই। আজ রাতের মধ্যে পরিষ্কার করানোও অসম্ভব। কাল মাঠে নামব কীভাবে?"

হ্যাঁ, সমস্যা বটে। ওরেল কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর খুব সহজভাবে বললেন, "তোমার জামাকাপড় আর জুতোটুতো আমায় দিয়ে দাও। দেখি, কী করা যায়।"

চোখ গোল হয়ে গেল কিংয়ের। ফ্রাংকির কী হল! কোনো লনড্রি কাল

ভোরের মধ্যে নিশ্চয় ডেলিভারি দিতে পারবে না। অন্য কোনো ব্যবস্থা করাও সম্ভব নয়। ফ্রাংকির কি সব গোলমাল হয়ে গেছে ? কিং নিরুত্তর হয়ে বসে রইলেন। ওদিকে ওরেল নির্বিকার। তাড়া দিলেন সতীর্থকে— "কী হল, তাড়াতাড়ি দাও। আর শোনো, কাল মাঠে ঠিক সময়ে তুমি তোমার জামাকাপড় পেয়ে যাবে। চিন্তা কোরো না। ভাল করে ঘুমিও। কাল খেলা।"

হতভম্ব হয়ে যাওয়া কিং কলের পুতুলের মতো যান্ত্রিকভাবে জামাকাপড়, জুতো, মোজা ওরেলের হাতে তুলে দিলেন। মুহূর্তের মধ্যে সে-সব নিয়ে ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেলেন ওরেল।

মাথায় চিন্তা নিয়ে ঘুমোতে গেলেন কিং। আগামীকাল যে কী হবে ! ভেস্তে যাবে না তো জামাইকাতে জীবনের প্রথম টেস্ট খেলার সুযোগ ? সকালে মাঠে গেলেন। পৌঁছনোমাত্রই ওরেল তাঁর হাতে একটা প্যাকেট দিয়ে বললেন, "নাও, এবার চটপট তৈরি হয়ে নাও।"

প্যাকেট খুলে কিং দেখলেন, ইস্ত্রি করা ধবধবে প্যান্ট-শার্ট আর তকতকে করে পরিষ্কার-করা বুট রয়েছে তাতে। ওরেল তাঁর কথা রেখেছেন।

"সেই মুহূর্তে ফ্রাংকির ওপর আমার শ্রদ্ধা শতগুণে বেড়ে গেল। কৃতজ্ঞতায় চোখে জল এসে গিয়েছিল প্রায়। আমি আজও আশ্চর্য হয়ে ভাবি, কেমন করে তিনি সব কিছু পরদিন সকালের মধ্যে রেডি করতে পারলেন ! সতীর্থের ওপর কতখানি ভালবাসা থাকলে, তাঁদের কথা কত গভীরভাবে ভাবলে এটা হয়, ভেবে আমার অবাক লাগে। তিনি একজন যথার্থ মানুষ, যথার্থ নেতা, যথার্থ ক্রিকেটার। এমন একজন মানুষকে আমি সতীর্থ হিসেবে, অধিনায়ক হিসেবে পেয়েছিলাম— এটা আমার মস্ত বড় গর্ব।" (ক্রমশ)

দাও রং

প্রসেনজিৎ গুহঠাকুরতা

খুট করে বাগানের
গেট যেই খুলি,
অমনি পেলাম এক
রংদার তুলি।
তুলিতে দিলাম যেই
আলগোছে টান,
শুনতে পেলাম আমি
সূর্যের গান।
গান শুনে ছুটে এল
একঝাঁক পাখি,
এসেই বলল তারা,
"দাও রং মাখি।"

ছবি : দেবাশিস দেব

বিজ্ঞানবিচিত্রা

চঞ্চল পাল

জাতে উঠল তামাক

শুধুমাত্র নিকোটিন নামক বিষাক্ত জিনিসটা আছে বলেই তামাকের এত বদনাম। অন্য শাক-সবজির মতো তামাকপাতারও যে খাদ্যগুণ আছে তা প্রথম শুনিয়েছেন কেন্‌টাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞানী শু জি শিন। কচি তামাকপাতায় নিকোটিন থাকে না বললেই চলে। তাছাড়া, একে বিশেষ পদ্ধতিতে জলে ভিজিয়ে গরম করলে এমন একটা বর্ণহীন, গন্ধহীন তরল পদার্থ পাওয়া যায় যা শুকোলেই পাওয়া যাবে বিশুদ্ধ প্রোটিন। এটাকে রুটি, ক্রিম, পানীয় বা যে-কোনও রান্নায় মিশিয়ে দিলে খাবারের স্বাদে কোনও হেরফের হবে না, অথচ খাদ্যের পুষ্টিকর উপাদান বেড়ে যাবে। সুতরাং, যেসব খাবার খুব মুখরোচক অথচ পুষ্টির দিক দিয়ে কোনও কাজেই আসে না, তাকেও যদি স্বাদ না বদলে পুষ্টিকর করে তোলা যায় তাহলে তো সোনায় সোহাগা!

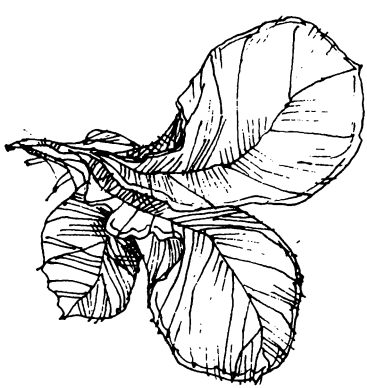

কাঠখেকোর কাণ্ড

ধাতু-পাথর-কাঠখেকো মহাজাগতিক পোকাদের সঙ্গে অনেক লড়াই করেছেন জাদুকর ম্যানড্রেক, কিন্তু আমাদের কারও সঙ্গে আজ পর্যন্ত এমন কোনও জীবের দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। সম্প্রতি টেরেডিনিডে-প্রজাতির একটা ছারপোকা দেখতে পাওয়া গেছে যারা বেমালুম কাঠ হজম করতে পারে। অবশ্য আসল কাজটা সারে এক ধরনের ব্যাকটিরিয়া—যারা ঐসব পোকার শরীরে জন্ম নেয়। কাঠে আছে সেলুলোজ নামক রাসায়নিক পদার্থ। এটাকে প্রোটিনে রূপান্তরিত করা যায় নাইট্রোজেন গ্যাসের সাহায্যে বিশেষ পদ্ধতিতে বিক্রিয়া ঘটিয়ে। কিন্তু এই আয়োজন অতিরিক্ত খরচ ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। অথচ ঐ ব্যাকটিরিয়ার এই ক্ষমতা এত বেশি যে কৃত্রিম উপায়ে ব্যাকটিরিয়াগুলোর বংশবৃদ্ধি করে গাছে ছেড়ে দিলেই কম খরচে ভূরি-ভূরি প্রোটিন মিলতে পারে। ভবিষ্যতে খাদ্য-সমস্যার সমাধানে এই পদ্ধতিটাই সবচেয়ে কাজে লাগবে কিনা কে জানে!

স্বপনদার হারানিধি

রেখা বড়ুয়া

চন্দননগরের জেঠুর বাড়িতে টি· ভি· রেডিও দুইই আছে, তাই আপত্তি হল না কারও। ওদিকে স্বপনদা তপনদা, দুই ভাইই ক্রিকেট-পাগল, তাতেই ভরসা করে রাজি হয়েছিল বিলটুরা, নইলে এই মরসুমে বাড়ি ছেড়ে বেরোয় কেউ। ছুটির দিন, জেঠিমা ফোন করে নেমন্তন্ন করেছিলেন যে, ওরা সারাদিনটা এখানে কাটিয়ে একেবারে বিকেলে চা-টা খেয়ে বাড়ি ফিরবে, তাছাড়া, একটু ঘরোয়া খাওয়াদাওয়াও হবে, কেননা, তপনদার মেয়ে টুকলির জন্মদিন আজ। মেজকাকু আর মেজকাকি যাবে এক মক্কেলের বাড়ি নেমন্তন্নে, তাই ওরা বাদে বাকিরা সব দল বেঁধে এসেছে বড় গাড়িটা ভর্তি হয়ে, এমনকি জহর পর্যন্ত। কিন্তু এসেই বোঝা গেল কিছু একটা অঘটন ঘটেছে। ব্যাপারটা কী ? এরা অবাক। এতক্ষণ তো এ-বাড়ি গমগম করবে রেডিওর ধারাবিবরণীতে, আর টি· ভি-র সামনে দাঁড়িয়ে দাঁত মাজতে মাজতে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে, কফি খেতে খেতে খেলা দেখবে আর শুনবে তপনদা স্বপনদা। ওরা আগে আগে ভাতের থালা নিয়ে চলে আসত এ-ঘরে, মাঝের লম্বা হাতির দাঁতের কাজকরা নিচু টেবিলের ওপর রেখে খাওয়া সারত খেলার সময়টা। কিন্তু এখন সেটা বন্ধ কারণ

একবার লয়েড আউট হওয়াতে স্বপনদার ডালের বাটি ছিটকে গিয়ে ধারাস্নান করিয়েছিল ললিতাবউদির কিনে আনা জাপানি পুতুলকে। যাই হোক, আজকের এ-নীরবতার কারণ খানিকটা বোঝা গেল বসার ঘরে উঁকি মেরেই। সে আসন শূন্য, টি· ভি· গেছে সারতে। কিন্তু রেডিও, সেটার কী হল ?

"আউট— আউট— ইমরান গেছে," পাশের বাড়ি থেকে আওয়াজ এল, সঙ্গে সঙ্গে পলটু ছুটে গিয়ে নবটা ঘুরিয়ে দিল ট্রানজিস্টারের। কিন্তু বৃথা, খট করে খালি শব্দ হল একটা।

"নেই," ফেটে পড়ল স্বপনদা, "ব্যাটারি বার করে লুকিয়ে রেখেছেন, নইলে কি আর বসে আছি সাধ করে ?"

"কে লুকোল ব্যাটারি, হ্যাঁ স্বপন ?" ছোটকাকির প্রশ্ন।

"কে আবার," ঝামরে উঠল স্বপনদা, "ওই যে উনি, উনি হলেন মোড়ল, আর ওটি হল চামচা।"

এবার ধীরে ধীরে পরিষ্কার হল সব। সকাল থেকে ললিতাবউদি আর ইতিবউদি ধরে বসেছে, দুপুরে খেলা শোনা বন্ধ রেখে ওদের নাটক শুনতে দিতে হবে, ডিটেকটিভ নাটক আছে—'দাঁড়কাকের কান্না'।

"ইয়ার্কি নাকি, স্বপনদা তেড়ে এসেছে, ভারী তো নাটক, একদিন না শুনলে কী হয় ?"

"ভারী তো খেলা," ললিতাবউদি বলেছে, "একদিন না শুনলে কী হয়, দুদিন তো শুনলে।"

শেষ পর্যন্ত বউদিরা বেঁকে বসেছে, নাটক শুনতে না দিলে ওদেরও খেলা শুনতে দেবে না, তাই ওরা ট্রানজিস্টারের ব্যাটারি খুলে লুকিয়ে রেখেছে, এরা খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়েছে, না পেয়ে আরও চটেছে।

"ভাল করে খুঁজে দেখেছ সব ?" বিলটু প্রশ্ন করল।

"সব—" গম্ভীর গলায় জবাব দিল তপনদা, "নতুন ব্যাটারি যে কিনে আনব তার উপায় নেই, এ-বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না।"

"বোল্ড—বোল্ড—গেছে আর একটা," পলটু চেঁচিয়ে উঠল জানলার কাছ থেকে।

"ধুত—থাকব না বাড়িতে, আমি চললাম কানাইদার বাড়ি।"

"ও স্বপন, লক্ষ্মী বাবা," জেঠিমা কাতরে উঠলেন, "আজ আর বাইরে যাসনি, একসঙ্গে খাবি সব—"

স্বপনদা একেবারে মারমুখো। বলল, "যাব না তো কী, তোমার আদরেই তো—"

"স্বপনদা, ব্যাটারি খুঁজে বার করাটা কিন্তু এমন কিছু শক্ত কাজ নয়," বিলটু এতক্ষণে মুখ খুলল। "পেয়ে যাবে ব্যাটারি, ভেবো না।"

"কে খুঁজে দেবে রহস্যভেদী বিলটুবাবু অ্যাণ্ড কোম্পানি ?" ললিতাবউদি চিমটি কাটল।

"কেন দেবে না," পলটু বলল রাগী গলায়, "সরোজমাসিমার চোর কে ধরে দিয়েছিল শুনি ?"

এবারে জহর এগিয়ে এল। বলল, "মিছে তক্ক করে কাজ কী পলটুবাবু, এসো হাত লাগাই সবাই মিলে।"

বিলটু বলল, "জহরদা ঠিক বলেছে, তবে আগে জানা দরকার ঠিক কোন্ সময় লুকিয়েছে, জানো কেউ ?"

তপনদা ভারী গলায় বলল, "সকালের চায়ের সময় কথা হল, তারপরেই—"

এরপর বেশ একপালা খোঁজাখুঁজি চলল। ললিতাবউদি বলল, "বাবার অফিস-ঘর যেন ঘাঁটাঘাঁটি কোরো না, ওখানে নেই কিন্তু।"

"মা'র শোবার ঘরেও না," যোগ করল ইতিবউদি, "আছে এই আশেপাশে, এখন খুঁজে বার করো দেখি বুদ্ধিমানেরা।"

এদিকে বেশ হিসেব করে সার্চ করছে ওরা, বসার ঘরের সোফার গদি উলটে, বউদিদের ড্রেসিংটেবিল হাঁটকে। মিনি গিয়ে ফ্রিজ খুলে দেখল, মাখনদানির ঢাকা খুলে, কিছুই বাদ রাখল না।

"হিঁ—ই—ইঁ—ই—" রুনির চিল-চিৎকারে ছুটে এল সবাই—কী হল, কামড়েছে নাকি কিছু? রুনি তখন তিড়বিড় করে লাফাচ্ছে ভাঁড়ারঘরের দরজার কাছে। রুনির কী দোষ, ও কি অত জানে? বন্ধ ইঁদুরকল দেখে ব্যাটারি আছে কিনা দেখার জন্যে যেই খুলেছে অমনি অ্যাত্ত বড় ধেড়ে ইঁদুর এক্কেবারে ওর কোলে, তাই তো ও চেঁচিয়েছে। মিনি বলল, "রুনিটা ভারী বোকা। কাজের সময় খালি গণ্ডগোল।"

"আচ্ছা দাদাভাই," পল্টু বলল, "বউদিরা খোঁপায় গুঁজে রাখেনি তো, সেই জলুমাসির মতো?"

"আহা, ওইটুকু তো খোঁপা ললিতাবউদির, ওর মধ্যে রাখা যায় ব্যাটারি? আর ইতিবউদির তো খোলা চুল।"

তা বটে। পলটু চুপ করে যায়, মিনি ঠিকই বলেছে।

"ওমা জহর, এ কী রে—" হাসির ধমকে জেঠিমার কথা আটকে যায়, "ওরে—"

জহরের নাম শুনে পুরো দলটা ছুটল সিঁড়ি বেয়ে চিলেকোঠায়। হায় ভগবান, এ কী কাণ্ড? সারা মেঝে ডাঁই হয়ে আছে, পুরনো ছেঁড়া লেপ গদি বালিশ, তার তলা থেকে খালি মুণ্ডুটা বেরিয়ে রয়েছে জহরের।

"ও বিলটুদাদাবাবু গো, আমারে বার করে নে যাও গো—, আমি চাপা পড়ে গিছি—" ওদের দেখে ডুকরে উঠল জহর। ব্যাপারটা সোজাই, পুরনো বিছানার পাহাড়ের মধ্যে ব্যাটারি খুঁজতে গিয়েই এই কাণ্ড। তবু রক্ষে যে বউদিরা এ-দৃশ্য দেখতে পায়নি, ওরা তখন নীচে পার্টি করে লুডো খেলায় দারুণ মত্ত।

বেলা প্রায় বারোটা বাজে, মুক্তোদি ঘরের মেজেয় ঠাঁই করার যোগাড় করছে, বিলটু চুপচাপ, ঘুরছে শোবার-ঘর থেকে খাবার-ঘর, খাবার-ঘর থেকে বউদিদের লুডোর আড্ডায়।

এদিকে এদের দারুণ জমেছে লুডোর আসর। দুই বউদি ছোটকাকি আর বিনোদপিসি। ললিতাবউদি আর বিনোদপিসির দল হারছে তাই বিলটুর দিকে আর নজর নেই। এর মধ্যে ঠাকুর এসে দাঁড়াল, বলল, "বউদিদি, কালিয়ার ঘি নেই, বার করে দিন।"

"আঃ ঠাকুর, বিরক্ত কোরো না তো," ললিতাবউদি বকে উঠল, "নিজে বার করে নাও না টিন থেকে।"

ওদিকে বসার ঘরে ব্যাটারি ফার্স্ট বোলার কেন হচ্ছে না, তা নিয়ে জোর তর্ক শুরু হয়েছে। স্বপনদা আপাতত ব্যাটারি হারানোর দুঃখ ভুলে ছোটকাকুর মতকে খণ্ডন করছে জোর গলায়। রুনি বউদির দেওয়া বড় পুতুলটা নিয়ে ব্যস্ত, মিনি শুকনো মুখে বসে পড়েছে খাটে, তার পাশে চিতপাত পলটু। চুলে আর কানের লতিতে তুলোর ফেঁসো নিয়ে গম্ভীর মুখে রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে

জহর। বিলটু ঘুরছে এদিক-ওদিক। মুখে কথা নেই কারও।

"বউদিদি—"

"আঃ ঠাকুর, এখন উঠতে পারব না।" ললিতাবউদি প্রাণপণে ঝাঁকিয়ে ছক্কা ফেলার চেষ্টা করছে।

"চাটনির চিনি আমি তাহলে ঢেলে নিচ্ছি বড় বয়াম থেকে," ঠাকুর বিরক্ত মুখে পেছন ফিরল।

"দাঁড়াও, ঠাকুর—অ্যাই চিনির বয়ামে—" মারের মুখে ঘুঁটি ফেলে উঠে দাঁড়িয়েছে ললিতাবউদি। ইতিবউদি বলল, "আমি যাই দিদি?"

কয়েক মিনিট পরে ললিতাবউদি চিনি দিয়ে ফিরে এল হাসিমুখে, বলল, "রান্না হয়ে গেছে, নাও, চটপট এ-বাজি শেষ করো।" ছক্কা পড়তেই মহাখুশি—ছয়—চার—

"চার—চার সপাটে মেরেছেন সুনীল—"

"দিদি, ট্রানজিস্টার—" আর্তনাদ করে উঠল ইতিবউদি।

"অ্যাঁ—বিলটু—বিলটু কোথায়—" আঁতকে উঠল ললিতাবউদি।

"এই যে আমি," হাসিমুখে এসে দাঁড়াল বিলটু, বলল, "ব্যাটারি লাগাতেই কী দারুণ আওয়াজ দেখেছ, আর সঙ্গে সঙ্গে গাওসকরের চার।"

"ভাঁড়ারঘরটা ঝেঁটিয়ে দেব নাকি বউদিমণি, চিনি পড়েছে বেশ," এক গাল হাসল জহর, "চিনির বয়াম থেকে বেরিয়ে ব্যাটারি বড় মিঠে আওয়াজ দিতে লেগেছে কিন্তু।"

সেদিন দুপুরে টুকলির জন্মদিনের খাওয়াটা কিন্তু খুব জমেছিল। নারকোলকোরা-দেওয়া মুগের ডাল আর ফুলকপির ডালনার পর সর্ষে-ইলিশে হাত দিয়ে ইতিবউদির দাদা পল্লবদা বলল, "যাই বলুন, বাহাদুর ছেলে কিন্তু বিলটুবাবু, তার শাকরেদরাও সব তৈরি।"

ঘি-গরমমশলার গন্ধওয়ালা লাল টুকটুকে মুরগির মাংসের টুকরো মুখে দিয়ে ভরামুখে পলটু বলল, "দাদাভাই বলেছিল না?"

বিলটু কিশমিশ পেস্তা দেওয়া ঘন সরপড়া পায়েসের বাটি কাছে টেনে বলল, "সবাই মিলে সব জায়গা খুঁজে না পেয়ে নিশ্চিত জানলাম যে এমন কোনো জায়গায় আছে যা আমরা কল্পনা করতে পারছি না। বউদিদের কিন্তু দারুণ বুদ্ধি, শুধু যদি না চিনির কথা শুনেই অমন ছুটত।"

"বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো," স্বপনদা টিপ্পনী কাটল আড়চোখে চেয়ে।

জেঠিমা বললেন, "কিন্তু সবথেকে খেটেছে আমাদের জহর, কোনোখানটা বাদ রাখেনি, বউমা, জহরকে ক্ষীরমোহন দাও, আর মালপোয়া।"

ভূরিভোজন শেষ হল, তারপর টুকলিকে আদর করা হল, লেস-বসানো গোলাপি নাইলনের ফ্রক দেওয়া হল, আর দুটো পুতুল। স্বপনদা তপনদা মহাখুশি, বীরদর্পে কান ফাটিয়ে খেলা শুনছে তারা, খালি বউদিরা মনমরা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুখে হাসি ফুটল ওদের, আকাশে মেঘ জমেছে, আলো কম হওয়ার জন্যে খেলা বন্ধ হয়ে গেল।

জোরালো ব্যাটারি, তার ওপর জহরের মতে চিনির বয়ামে থেকে আওয়াজ মিষ্টি হয়েছে আরও, মনের আনন্দে তাই পাড়া কাঁপিয়ে 'দাঁড়কাকের কান্না' শুনল বউদিরা, সেই সঙ্গে অবশ্য স্বপনদা, তপনদা এবং বিলটু অ্যাণ্ড কোম্পানিও।

ছবি : প্রবীর সেন

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

রোভার্সের রয়

রোভার্স-সদস্য-সমিতি জানিয়েছিল, উদ্ধত ভিক্ গাথ্‌রিকে মাঠে নামালে তারা খেলা বয়কট করবে। ওলডফিল্ডের বিরুদ্ধে রোভার্স এক গোলে এগিয়ে। এমন সময় ....

চালিয়ে যাও, রোভার্স !

আরে, এ যে আমাদের ভক্তের গলা !

যাক, অন্তত একজন এসেছে !

কোথায় লোকটা ?

ওই তো, গোলের বাঁ দিকে !

অন্যদিকে, আরও তিনজন !

ওদিকে আরও দুজন !

রোভার্স ! রোভার্স !

সব জায়গায় ওরা !

প্রচুর ভক্ত !

নিষেধাজ্ঞা মানেনি !

যাক, বাঁচা গেল !

ওহে রয়, এবারে খেলা শুরু করতে পারি ?

করুন !

প্রাণ দিয়ে লড়ে যাও !

নিশ্চয় !

নিশ্চয় !

ভিক্ যাতে লড়ে, সেদিকেও নজর দাও !

দেব বই কী !

রোভার্সের ডিফেন্সও এখন দুর্ভেদ্য ....

এগোও, ম্যাকে !

গাথ্‌রির কথা শুনলে ?

এই নাও !

ম্যাকে গাথ্‌রিকে বল দিয়েছে !

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

না, না,এটা কসাইয়ের দোকান নয় ! আর হ্যাঁ, শুনুন, ঝড়বৃষ্টির সময় টেলিফোন করা খুবই বিপজ্জনক !
কড়াত
গুম্ গুম্
?
ক্যাপ্টেন কোথায় ? সর্বনাশ !
যত্ত সব !
?
মরেছিলুম আর কী !
কড়াত
টিং লিং টিং
টিং লিং টিং
যাঃ ! চিনা ভাস্‌টা গেল !
ভাঙল কী করে ? নিশ্চয়ই বজ্রপাতের জন্যে নয় !
কিছুছু বুঝতে পারছি না !
ঝনাত
আবার ?
ভো-ও-ও-ও
ফ্যাশ
গরর্‌র্‌
গরর্‌র্‌
যাঃ, দামি আয়নাটা গেল !
এবারে অবশ্য কুটুস ভেঙেছে !
তা কী করে বলো ক্যাপ্টেন ?
কড়াত
যাঃ, ইলেকট্রিকও গেল !
দুম দুম দুম
এই দুর্যোগে আবার কে এল ?
দুম দুম দুম

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

প্রেসার কুকারে রান্না করাটা যদি রপ্ত করে নেন, তবে আপনার গ্যাস দ্বিগুণ সময় চলবে।

"কিন্তু আমি তো প্রেসার কুকারেই রান্না করি" হয়তো সব সময় করেন না। কিম্বা হয়তো আরো সঠিকভাবে প্রেসার কুকার ব্যবহার করতে পারেন।

যেমন ধরুন, আপনি যদি কুকারে সেপারেটার বসিয়ে ভাত, ডাল, আর তরকারি তিনটে একই সংগে রাঁধেন, তবে অনেকটা জ্বালানী বাঁচাতে পারবেন। আর আপনার পুরো রান্নাটাই হয়ে যাবে কয়েক মিনিটে।

প্রেসার কুকারে রান্না হলে জ্বালানী বাঁচে।

প্রেসার কুকারে রান্নাটা হয় সবচেয়ে তাড়াতাড়ি আর কম খরচে। প্রেসার কুকারে রাঁধুন; শুধু তাতেই দেখবেন জ্বালানী খরচ ৩০% কমে গেছে।

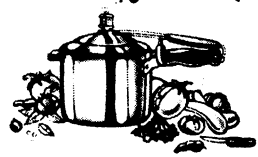

পরীক্ষা করে দেখা গেছে, সাধারণ পদ্ধতির চেয়ে প্রেসার কুকারে রান্না করে ভাতের বেলায় ২০% ভিজানো ডালের বেলায় ৪৬% এবং মাংসের বেলায় ৪২% জ্বালানী বাঁচে। এছাড়া সময় আর পয়সার সাশ্রয় তো বটেই।

ঢাকনা দিয়ে তাপের অপচয় বন্ধ করুন।

যে বাসনে রান্না করবেন তার মুখে ঢাকনা দিলেই ভাল। এতে তাপ পাত্রের

মধ্যেই থাকে। তাতে রান্নাও চটপট হয় আর ১৫% জ্বালানী কম লাগে।

ছড়ানো ও চ্যাপটা ধরণের বাসন ব্যবহার করা ভাল।

রান্নার বাসনের বাইরে যদি আঁচ বেরিয়ে যায় তবে তাপটা পাত্রে ঠিকমত লাগে না। অতএব জ্বালানীর বাজে

HTD-PCR-8056-A BEN

খরচ হয়। চ্যাপটা ও ছড়ানো পাত্র আঁচটা পুরোপুরি পায়, রান্নাও তাড়া-

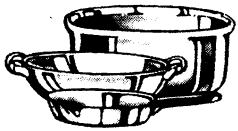

তাড়ি হয়ে যায়। ছোট বাসনে রান্না করতে হলে', আঁচটা কমিয়ে দিন। ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, বেশীর ভাগ স্টোভেই ২৫ সেন্টি-মিটার ব্যাসের বাসনই উপযুক্ত।

রান্নার বাসন পরিষ্কার রাখবেন।

অনেক সময়েই কেটলি এবং কুকারে নুনের একটা সূক্ষ্ম স্তর লেগে থাকে। এই স্তরটা যদি ১ মিলিমিটারেরও হয়, তাহলেও বাসনের ভেতরের মাল মসলায় তাপের সঞ্চারণ কমে যাবে। এতে আপনার জ্বালানী খরচ প্রায় ১০% পর্যন্ত

বেড়ে যাবে। সুতরাং সর্বদা বাসনের ভেতরটা ভাল করে মাজিয়ে নেবেন।

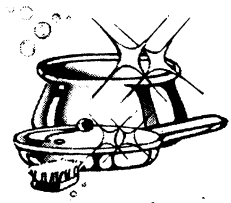

আমাদের পরীক্ষিত ইন্ধন সাশ্রয়ী নানান উপায়ের এই সহজ হদিশ ক'টা মেনে চলুন। এবং আরো কয়েকটা উপায়ের জন্য অপেক্ষা করুন। দেখবেন আপনার জ্বালানী, টাকা আর রান্নার সময়--কত কম লাগে। আপনার কেরোসিন স্টোভ অথবা গ্যাস সিলিণ্ডারের ওপরেও চাপ কম পড়বে, সেই সংগে সংসার খরচেও।

একটু ভেবে দেখুন।

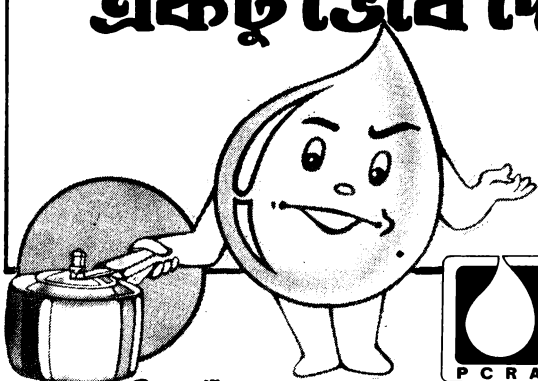

কেরোসিন বাঁচান।
রান্নার গ্যাস বাঁচান।

কারণ তেল চিরদিন থাকবে না।

PCRA

পেট্রোলিয়াম কনজার্ভেশন রিসার্চ এ্যাসোসিয়েশন

৩০৬, সেঠী ভবন, ৭-রাজেন্দ্র প্লেস
নিউ দিল্লী-১১০০০৮

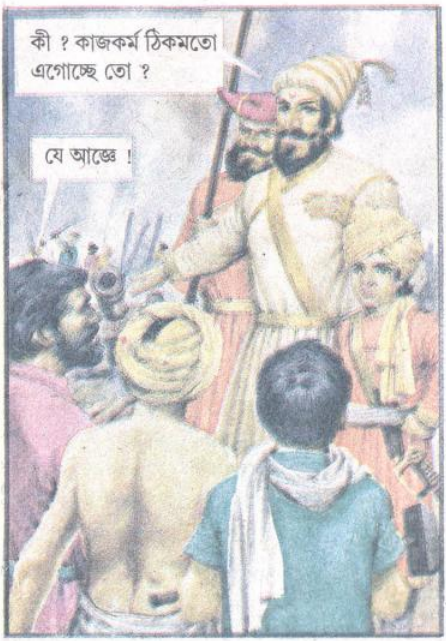

তোর্না দুর্গে জিজাবাঈ-এর মহলের পাশে একটা ছোট্ট কুঠুরিতে সদাশিবের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে ।

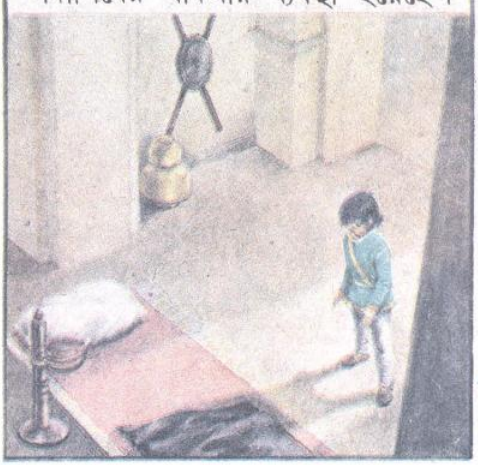

মাঝে মাঝে
আশেপাশে কেউ আছে কি না দেখে নিয়ে···

চিত্রনাট্য : তরুণ মজুমদার ছবি : বিমল দাস

…সদাশিব নিজের বিছানাটার পাশে গিয়ে বসে ।

বালিশের খোলের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে চুপিচুপি বার করে আনে…

…কুঙ্কুর জন্যে রাখা সেই **আংটিটা** !

কিনলুম তো খুব ! কে জানে, কোনোদিন ওর হাতে দেওয়া হবে কি না । হয়তো এ জন্মে কুঙ্কুর সঙ্গে দেখাই হবে না আর ।

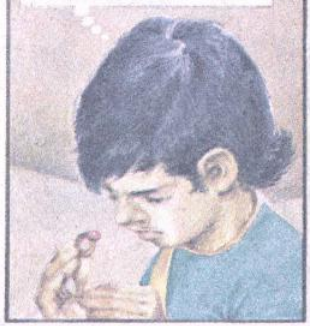

কিছুক্ষণ আংটিটাকে নেড়েচেড়ে আবার বালিশের খোলের মধ্যে লুকিয়ে রাখে সদাশিব ।

তারপর চুপিচুপি ঘর থেকে বেরিয়ে যায় ।

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

খেলা

সুব্রত চট্টরাজ

রাতুলের ডাকনাম নোটন। দুটো নামেই সে সাড়া দেয়। তবে এর মধ্যে একটা মজা আছে। মামার বাড়িতে তার নাম নোটন আর বাবার কাছে রাতুল। এই নাম যদি পালটাপালটি হয়ে যায়, সে সাড়া দেয় না। কেবল বাতাসকে স্লেট করে আঙুল দিয়ে যে নামে ডাকলে সে খুশি হবে সেই নামটা লেখে। অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করে। যখন কিছুতেই বোঝাতে পারে না তখন সুর তুলে চিৎকার করে নিজের নামটা বলতে বলতে মিলিয়ে যায়। আজ বিকেলেই ঘটল ব্যাপারটা।

এখানে তাকে কেউ রাতুল বলে ডেকো না। যতই ডাকো সাড়া পাবে না। নোটন দিন-পাঁচেক হল মামাবাড়ি ঘাটশিলায় বেড়াতে এসেছে। মায়ের সঙ্গে। এখন পুজোর ছুটি। অবশ্য পুজোর চারটে দিন জামশেদপুরে কাটিয়ে মামার বাড়িতে এসেছে। পুজো কেটে যাবার পরেও নোটনের মনে এখনও পুজোর ঢাক গুড়গুড় করে বাজে, বিশেষ করে বিকেল হলেই। এর ফাঁকে ফাঁকে একটা ছোট্ট ভয়ের এক টুকরো কালো মেঘ তার মনে উঁকি দিয়ে যায়। যখন সন্ধে হয়। রেললাইন থেকে ফেরার সময় যখন দেখে বাড়িতে-বাড়িতে আলো জ্বলে। যখন তুলসীতলায় বাড়ির বউরা সন্ধে দেয়। শাখের তীব্র ঝংকারের সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে পড়ে যায় এখান থেকে ফিরেই ক্লাস সিক্সের ফাইনাল পরীক্ষার জন্যে তাকে তৈরি হতে হবে। ফাঁকা মাঠে ভয়টা যেন তাকে বেশি করে পেয়ে বসে। যত বাড়ির কাছে আসতে থাকে সেটা ফিকে হয়ে যায়। বাড়িতে ফিরলেই আর পাঁচটা কথাবার্তা হৈ-হট্টগোলে সেই কালো মেঘের টুকরোটা পালিয়ে যায়।

ঘাটশিলায় যেদিন নোটন মায়ের হাত ধরে নামল, সেদিন বাবুইমামা স্টেশনে। টিপ-টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। পুজোটা অক্টোবরের মাঝামাঝি হওয়াতে শীতটা বিকেল হলেই নামে। আজকে শীতে-বৃষ্টিতে খুব ভাব। মা বাস্কেট থেকে সোয়েটারটা বের করে নোটনের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। ঘাটশিলায় নেমেই মা একবার তাকে রাতুল বলে ডেকেছিলেন। নোটন সাড়া দেয়নি। নোটন শূন্যে আঙুলটা দুলিয়ে দুলিয়ে লিখেছিল মামার বাড়ি।

বাড়ি পৌঁছেই মা নোটনের মধ্যে একটা ছটপটে ভাব লক্ষ করেছেন। সেটা রাজীবকে কেন্দ্র করে। দিদিমাকে জড়িয়ে ধরেই নোটন প্রথমেই জানতে চাইল, "দিদা তোমার কাছে রাজীব এসেছিল ? আমার চিঠি ও পেয়েছে ?" কিন্তু দিদা দুঃখের সঙ্গে মাথা নাড়তেই নোটনের ছটফটানি শুরু হয়েছে। মা, বাবুইমামা, দিদা সবাই বলছেন—"কালকে সকাল হলেই যাবি।" আজ এই সন্ধেবেলা, তার ওপর বৃষ্টি পড়ছে, এখন না গেলেই নয়। কিছুতেই নোটন কথা শুনবে না। শেষ পর্যন্ত বৃষ্টি দিল বাধা। এমন ঝেঁপে নামল যে নোটন নিজের থেকেই বুঝতে পারল আজকে আর রাজীব-দর্শন কপালে নেই। রাজীবের জন্যে নোটন জামশেদপুর থেকে এবার একটা মজার জিনিস এনেছে। একটা দামি বিলিতি কুকুরের বই। বাবা গত সপ্তাহে কলকাতা এসেছিলেন। বাবাকে দিয়ে সে আনিয়েছে। রাজীব কুকুর-পাগল। ওদের বাড়িতে দু-দুটো কুকুর। আগেরটা অ্যালসেশিয়ান। কিছুদিন হল যে নতুন বাচ্চাটা এসেছে সেটা ডোবারম্যান। সেই বইটা যতক্ষণ পর্যন্ত না রাজীবের হাতে তুলে দিতে পারছে নোটনের যেন ঘুম নেই।

চোখে। একটা চমক সে দিতে চায়। নতুন বইটার গন্ধ শুঁকিয়ে সে রাজীবকে বুঝিয়ে দিতে চায় কতটা ভালবাসে তাকে। কিন্তু তা আর এ-রাতের মতো হবার নয়।

সে-রাত নোটনকে স্থির হয়ে বসতে দেয়নি। বারবার জানলার কাছে এসে বাইরে হাত-বাড়িয়ে বৃষ্টির ঝাপটা অনুমান করতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু একবারের জন্যেও বৃষ্টি তাকে খুশি করতে পারেনি। দেখতে দেখতে সন্ধে গড়িয়ে গেছে রাতের দিকে। আর নোটন খালি ভেবেছে রাত কখন শেষ হয়ে ভোর হবে। তারপর এই পাঁচটা দিন কখন যে চলে গেল নোটনের তা খেয়ালই নেই। শুধু রাজীব, রাজীব, রাজীব। রাতে ঘুমোনোটুকু বাদ দিলে নোটন-রাজীব মানিকজোড়ের মতো ঘুরে বেড়ায় ঘাটশিলার আনাচে-কানাচে। শুধু বিকেল হলেই তারা দু-জনে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে বসে। রেললাইনের ধারে। প্রত্যেকদিন এই বিকেলবেলা একটা মালগাড়ি জামশেদপুর থেকে ঘাটশিলা হয়ে কোন একটা খনির দিকে চলে যায়। প্রত্যেকদিন এই সময়টায়। আর এই রেল গাড়িটাকে নিয়ে তারা দুজনে একটা খেলায় মেতে ওঠে। যেটা ভীষণ বিপজ্জনক। সেটা কোনোমতেই খেলা নয়। তবু তারা এর থেকে মজা পায়। বিকেল হলেই, যেখানেই দুজনে থাকুক না কেন এই রেললাইনের ধারে ছুটে আসবেই। একটা হাতছানিতে তাদের পেয়ে বসে। কিছুতেই না এসে থাকতে পারে না। তারপরে ঠিক সেই সময়টা এগিয়ে এলেই, তাদের বুকের ভেতরে দুরু-দুরু করে ডাক পড়ে আর শুরু হয় সেই খেলা।

আজ বিকেলে রেললাইনের ধারে একটা বিরাট পাথরের চাঙড়ের ওপর নোটন বসে আছে। রাজীব পাশে নেই। বিকেলে রাজীব নোটনকে ডাকতে গেছল। আর সেই সময়েই রাজীবের মাথায় ছোট্ট একটা দুষ্টু-বুদ্ধি খেলা করে যায়। ও জানে নোটন এতে রেগে যাবে। বেশি বেশি করলে নোটন মুখ-চোখ লাল করে একা গুম মেরে বসে থাকে। তবুও রাজীব ভাবে একটু দুষ্টুমি আজকের মতো করাই যাক না। কালই তো নোটন জামশেদপুর চলে যাবে। নোটন রাস্তার দিকে চেয়ে হাঁকপাঁক করে কখন রাজীব আসে। এমন সময় বাইরে থেকে ভেসে এল: রাতুল, রাতুল। হাঁকটা শুনেই নোটন বেরিয়ে এসে দেখে দরজায় দাঁড়িয়ে রাজীব। "রাতুল, তাড়াতাড়ি। আর কিন্তু বেশি দেরি নেই।" বলেই রাজীব নোটনের দিকে হাতের একটা ইঙ্গিত করল। নোটন চিৎকার করে রাজীবকে বলল, "আমাকে ও-নামে ডাকতে তোকে বারণ করেছি না? আগে নোটন বলে ডাক, তবে যাব।" নোটন তার রাতুল নামটা আর কারো মুখে শুনতে চায় না, শুধু একটা মুখ ছাড়া। সে চায় একমাত্র তার বাবাই তাকে ঐ নামে ডাকুক। আর কেউ নয়। অজান্তে এই অধিকার নোটন তার বাবাকে দিয়ে দিয়েছে। তার বাবাও হয়তো জানেন না। কিন্তু শুধু নোটন চায় এই রাতুল নামের মধ্যে দিয়ে সে আর তার বাবা পরস্পরের খুব কাছে অথচ অন্য সবার থেকে দূরে থাকে। তবু রাজীব আবার ডাকে—"রাতুল"। বলতেই নোটন কান্নায় ভেঙে পড়ল। সে-বিকেলে রাজীব কিছুতেই যখন তার অভিমান ভাঙাতে পারল না, একসময় মনখারাপ করে বাড়ি ফিরে গেল। বিকেলটাকে নিয়ে যেমনভাবে খেলবে ভেবেছিল দুজনে, তা যেন হতে গিয়ে হল না। রাজীব ভাবে এরকমটা না করলেই বোধহয় ভাল হত। কিন্তু একবার যখন হয়ে গেছে তখন আর কী-ই বা করা যায়।

এই সব সাত-পাঁচ রাজীব যখন বাড়িতে বসে ভাবে, অনুশোচনা করে, নোটন তখন সেই নেশার টানে ছুটতে-ছুটতে আসে

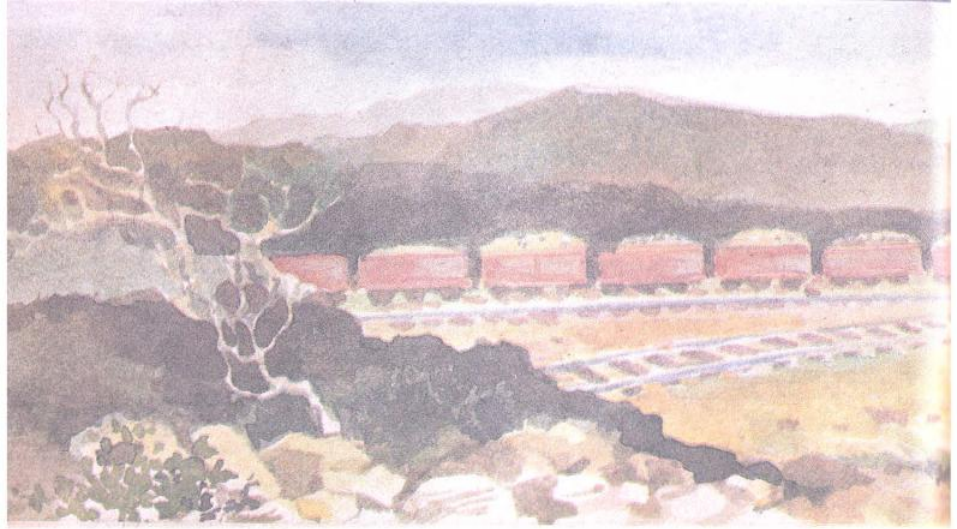

রেললাইনের ধারে। এসেই চারধারে রাজীবকে খুঁজতে থাকে। সে যে আসবে না এ তো ভাবাই যায় না। নোটন ভাবে রাজীব নিশ্চয়ই এখানে-সেখানে কোথাও লুকিয়ে আছে, রেলগাড়িটা এলেই বেরিয়ে আসবে। এখন তাড়াতাড়ি পাথরগুলো সাজিয়ে ফেলি এই ভেবেই সেই বিরাট পাথরটা থেকে নোটন তড়াক করে লাফিয়ে নেমে রেললাইনের দিকে দৌড়ে যায়। পাশাপাশি মাঠ থেকে বেশ কয়েকটা বড় বড় নুড়ি কুড়িয়ে রেললাইনটার ওপর পেতে রাখে। লাইনের কাঁপন আর তার সঙ্গে দূরের আওয়াজ শুনেই নোটন বুঝতে পারে রেলগাড়ি আসছে। এক ছুটে দূরে পালিয়ে গিয়ে লুকিয়ে যায় এক গাছের ওপাশটায়। চারদিকে চিরে-চিরে রাজীবকে খোঁজে। কোথাও নেই সে। একা সে লুকিয়ে আছে এই বিরাট প্রান্তরে। এই প্রথম সে একা এই খেলার সাক্ষী।

রাজীব নেই। ওদিকে রেলগাড়ি এগিয়ে আসছে। একটা দুরু-দুরু ভয় বড় হতে হতে তার বুকের ভেতর দুম-দুম করে কিল মারে। কোনোখানে কোনো আওয়াজ নেই। রেলগাড়ির একটানা ঘষটানি-আওয়াজ। হুইশল্ দিতেই নোটন ভীষণ চমকে ওঠে। এবার সত্যি-সত্যিই সে ভয় পেয়ে গেল।

অন্যদিন রেলগাড়িটা ভয়ংকরভাবে রেললাইনে বসানো পাথরগুলোর ওপর দিয়ে যেতে যেতে দোলে, তারপরে আস্তে আস্তে নিজের গন্তব্যস্থানের দিকে চলে যায়। রেলগাড়িটা অনেক দূর চলে গেলে পর নোটন আর রাজীব রেললাইনের সেই নির্দিষ্ট জায়গাটাতে গিয়ে দেখত অনেকটা গুঁড়ো-গুঁড়ো পাউডার পড়ে আছে, মাটির মতো রঙ। এই খেলাই তাদের প্রত্যেকদিন টেনে আনে রেললাইনের পাশে।

কিন্তু আজ আর সে-রকম হল না। নোটন দেখল, রেলগাড়িটা আস্তে আস্তে ঠিক পাথরগুলোর সামনে থেমে গেল আর কালো পোশাক-পরা একটা লোক ইঞ্জিন থেকে ঝুপ করে নেমে খুব জোরে দৌড়ে আসছে তার দিকে। তাকে ধরার জন্যে। নোটন প্রচণ্ড ভয় পেয়ে পেছন ফিরে যেই ছুটতে যাবে, অমনি এক প্রচণ্ড শক্তিশালী কালো রঙের হাত তাকে ঝপ করে ধরে

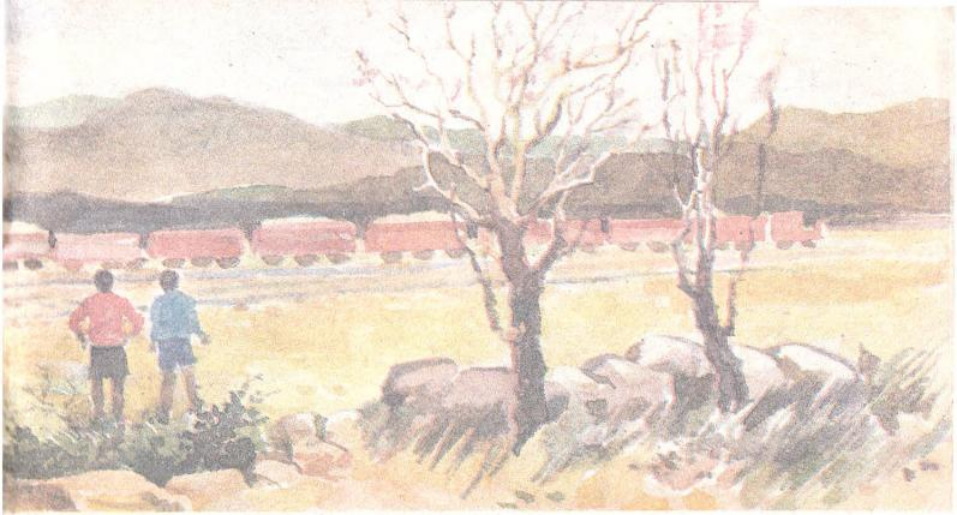

ফেলল। প্রচণ্ড ভয়ে নোটনের কান্না এল না। তার মনে হল সে কিছুক্ষণের জন্যে বোবা এবং কালা হয়ে গেছে। শুধু চোখের সামনে ভেসে উঠছে রাজীব, দিদা, মা, বাবুইমামা, আর সবচাইতে বেশি করে সেই একজনের মুখ, যে তাকে রাতুল বলে ডাকলে নোটন আর কিছু চায় না। আর তক্ষুনি নোটন কান্নায় ভেঙে পড়ল। ইঞ্জিনের ড্রাইভার নোটনকে টানতে-টানতে কিছু দূর নিয়ে যায় আর বার-বার জিজ্ঞেস করে তার নাম, বাড়ি কোথায়। নোটন ভয়ে গড়-গড় করে সত্যি-সত্যি সব বলে দেয়।

এমন সময় একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে যায়। সেই ইঞ্জিনটা রেলগাড়িটাকে নিয়ে হুড়মুড় করে চলতে শুরু করে দিয়েছে। ড্রাইভার-ছাড়া অবস্থায় দ্রুত গড়িয়ে যেতে থাকে। এই না দেখে ড্রাইভার নোটনকে এক ঝটকায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ইঞ্জিনের দিকে দৌড়োতে থাকে। যদি কোনোরকমে সেটাকে থামানো যায়। নোটনের মুক্তি তার ভয় কাটিয়ে দেয়, কিন্তু এই অভাবনীয় ব্যাপারে সে দিশেহারা হয়ে পড়ল। ড্রাইভারের পেছন-পেছন সে ছুটতে থাকে শেষ পর্যন্ত কী হয় দেখবে বলে। রেলগাড়ি যত গড়িয়ে যেতে থাকে তত তার গতি বেড়ে যায়। একটা দড়িছেঁড়া বিরাট মোষের মতো রেলগাড়িটা নীচের দিকে নেমে যায়। ড্রাইভার ছুটে তার নাগাল ধরতে পারে না।

নোটন এক সময় দেখতে পেল রেলগাড়িটা একটা লাইন থেকে আর একটা লাইনে ছিটকে গিয়ে একটা বিরাট কাঠের বাফারে গিয়ে ধাক্কা মারল। আর তারপরেই একটা বিকট শব্দে চারদিক গম-গম করে ওঠে। ড্রাইভারের পেছন-পেছন যখন সে এসে দাঁড়ায়, দেখে রেলগাড়িটা মুখ থুবড়ে রেললাইনের বাইরে পড়ে আছে। নোটন ড্রাইভারের মুখ দেখে বুঝতে পারে, সে যেমন ভয় পেয়ে গেছল ড্রাইভারও তেমনি ভয় পেয়ে গেছে। শুধু নোটন মুক্ত হয়ে গেছে কিন্তু ড্রাইভারের কী হবে ? নোটন ড্রাইভারের দিকে চায়, ড্রাইভার নোটনের দিকে। সন্ধে হয়ে আসছে। নোটন বুকের মধ্যে শুনতে পেল, রাতুল রাতুল।

ছবি : নির্মলেন্দু মণ্ডল

পালকের টুপি

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

কিছুদিন পর ফের শহরের লোকেরা সেই ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পেল। দূর আকাশের নীচে কারা ঘণ্টা বাজিয়ে বাতাসে ভেসে চলে যায়। ঠিক যেন কোনো দমকলের ঘণ্টা বাজে। তখন আকাশ নীল, স্বচ্ছ। পাইন গাছগুলোর মাথায় আশ্চর্য সাদা জ্যোৎস্না। প্রবীণেরা কান পেতে শুনলেন ঘণ্টাধ্বনি। অলুক্ষুনে এই শব্দমালা কীভাবে কোথায় যে ভেসে যায়। বলাবলি করলেন, লুসির সেই ভুতুড়ে মেয়েটা ঠিক আবার বাবার খোঁজে বের হয়ে পড়েছে। কিন্তু শহরের বুড়োরা শুনল, গির্জার ঘণ্টাধ্বনি। সেই অলৌকিক দেবদূত এসে বুঝি আবার শহরটায় ঘণ্টা বাজাতে শুরু করেছে।

আর যুবক-যুবতীরা দেখল, বিন্দুর মতো দুই নক্ষত্র আকাশে ভাসমান। বাতাসে ভেসে ভেসে সমুদ্রের ওপারে ক্রমে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। কেবল শিশুরাই জানে আসল রহস্যটা কী। ওরা বোঝে, সে এক ছোট্ট মেয়ে, নাম ম্যাগুেলা, গায়ে তার সাদা ফ্রক—সে যাচ্ছে তার বাবাকে খুঁজতে। সঙ্গে থাকে একটা ছোট্ট ক্যাঙারুর বাচ্চা—নাম হাইতিতি, গলায় সোনালি রিবনে রুপোর ঘণ্টা। বাতাসে ভেসে যাবার সময় ঘণ্টাটা ঢং-ঢং করে বাজে।

বুড়োরা বলে, ভুতুড়ে মেয়ে না ছাই, কোনো দেবদূতের কাজ এটা। না হলে শহরের মাথায় কার দায় পড়েছে ঘণ্টা

বাজাবার। প্রবীণেরা বিষয়টাতে খুবই খাপ্পা। জাদুকরের ভোজবাজি না ছাই—এ কোনো অশুভ আত্মার কারসাজি। তাদেরই অশুভ প্রভাবে লুসির মেয়েটা মাঝে-মাঝে বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে যায়।

যুবক-যুবতীরা ভেবে থাকে কোনো অদৃশ্য বিজ্ঞানী, মানুষের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে গিয়ে ম্যাণ্ডেলার মতো এমন একটি সুন্দর বাচ্চাকে বেছে নিয়েছে। আহা রে বেচারা!

কেবল শিশুরা তখন চিৎকার করে বলে, তারা যা দেখতে পায় বড়রা তা পায় না। বড়দের মাথায় শেকড় গজিয়ে গেছে। ওদের সব চুল-দাড়ি কামিয়ে দাও। ওরা শিশু হয়ে যাক। তারপর প্রার্থনার ভঙ্গিতে বসে পরম দয়াময় যিশুর কাছে প্রার্থনা করতে থাকে—হে যিশু, হে দয়াময়, বড়দের চোখ-কান খুলে দাও।

তারা সব কিছু আমাদের মতো দেখতে পাক। ম্যাণ্ডেলার বাবা জাহাজডুবিতে নিখোঁজ। বাবা না থাকলে মানুষের কিছু থাকে না। বাবার সঙ্গে ফাঁকা রাস্তায় কার না বেড়াতে ভাল লাগে। পাইন ফেস্টিভ্যালে সবার বাবা সঙ্গে থাকে, ম্যাণ্ডেলার থাকে না, কী কষ্ট বলো। ও যেন ওর বাবাকে খুঁজে পেয়ে যায়।

লুসি, টিকাকি দুজনই খুঁজছে। দাদাকে ফোনও করতে পারছে না। ডাক্তার মানুষ। সারাদিন হাসপাতাল, অপারেশন, নার্সিংহোম করে যখন রাতে ফিরে আসেন, তখন ক্লান্ত থাকারই কথা। ফোন পেলেই বলবেন, আবার!

হ্যাঁ দাদা। কোথাও তো দেখছি না! লুসি তখন কী যে করে! সে উপত্যকার নীচে নেমে ডাকল, ম্যাণ্ডেলা।

টিকাকি হাতে লণ্ঠন তুলে ডাকল, "ম্যাণ্ডেলাদিদি।"

না, কোনো সাড়া নেই। টিকাকি বলল, "বজ্জাত হাইতিতিটার এ-সব কাজ। কেমন মিটিমিটি সব দেখে। দু-পায়ে ভর করে বসে থাকে। আজ সারা বিকেল ম্যাণ্ডেলাদিদির কী সাধাসাধি। একরত্তি মুখে দেয়নি। আঙুর খায়নি। আপেল খায়নি। বাঁধা থাকতে তেনার ভাল লাগছে না।"

লুসি জোরে জোরে ডাকল, "ম্যাণ্ডেলা তুমি কোথায়?"

সাড়া নেই।

কেবল সামনের পাইনের বন থেকে আশ্চর্য এক মিউজিক ভেসে আসছে।

একটুখানি খাটিয়ে মাথা জুড়ে পরের পর–
আমায় দিয়ে সাজিয়ে তোলো তোমার খেলাঘর!

চট্‌পট্ করতে
কোনোকিছু গড়তে
এট-ওটা সাঁটানোর
সময়টা কাটানোর
সবসেরা মজাদার
ফেভিকল **এম-আর**।
আমোদই শুধু নাই
হাত বসে যাওয়া চাই
বড় হয়ে দেখো ঠিক
হবে বড় যান্ত্রিক।
আজ শুধু মণিহারী
খেলনার রকমারি
পুতুলের ঘরদোর
বাঘা–হাতি–বান্দর
ছোটদের হাতে দাও
আলমারিতে সাজাও
টিকে যাবে বরাবর
নিখুঁত যে এর জোড়
একেবারে নয়া হয়ে
চিরকাল যাবে র'য়ে
চিরসাথী যে তোমার
ফেভিকল **এম-আর**।

তোমার দরকার হবে:

- শাটল-কক বাক্স/ট্যালকম পাউডারের গোল খালি টিন যার ঢাকনাটি ক্যান-ওপেনার দিয়ে কেটে নেওয়া হয়েছে।
- ব্যবহার করা হয়েছে এমন সুতোর রীল (কার্ডবোর্ড)
- পাতলা কার্ডবোর্ডের গোল টুকরো
- ভেলভেট কাগজ, নীল, সাদা, গোলাপী আর ধূসর রঙের
- পুরোনো কাগজ
- ফেভিকল এম আর অ্যাডহীসিভ

১। বাক্স/টিন পুরোনো কাগজ দিয়ে অর্দ্ধেক ভর্তি করে উচ্চতাটি ছোট করে নাও। পুরোনো কাগজের ওপর কার্ডবোর্ডের গোল টুকরো ফেভিকল এম.আর. দিয়ে জুড়ে দাও।

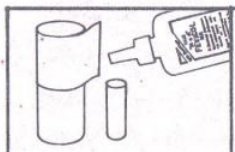

২। ওপরের কোণের দিকে গোলাপী কাগজ জুড়ে দাও। নীল কাগজ নীচের দিকে আর সুতোর রীলের ওপর জুড়ে দাও।

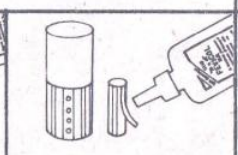

৩। জোকারের জামা বানানোর জন্য সাদা কাগজ টুকরো করে কেটে নাও। বোতাম ও বো কেটে নাও। এটি আর সুতোর রীল নীচের দিকে জুড়ে দাও, ঠিক যেমনটি দেখানো হয়েছে সেই ভাবে।

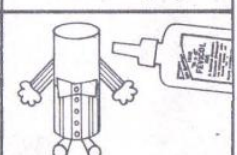

৪। রীলটি আধখানা করে কেটে নাও আর দু'পাশে হাতের মত লাগিয়ে দাও। কেটে নিয়ে তৈরী করে গোলাপী হাত পা লাগাও।

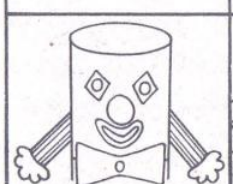

৫। জিফির নাক চোখ আর মুখ কেটে নাও আর ওপরের দিকে জুড়ে দাও।

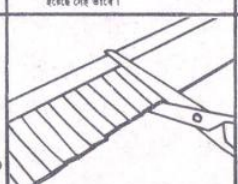

৬। জিফির চুলের জন্য ধূসর রঙের ভেলভেট কাগজ খুব ছোট করে কেটে নিয়ে জুড়ে দাও, যেমনটি দেখানো হয়েছে সেইভাবে।

৭। টুকরো কাগজ টিনের ভেতরের দিকে এমনভাবে জুড়ে দাও যাতে খানিকটা বাইরে উপচে পড়ে।

এবার প্রাণখুলে হাসো। তৈরী হয়ে গেছে তোমার জিফি জোকার।
এখন এটি তোমার কলম পেন্সিলের হিসাব ঠিকমত রাখবে।

ফেভিকল এম-আর

সিন্থেটিক অ্যাডহীসিভ

সেরা জিনিষ গড়তে চাও
সেরাটি দিয়েই জুড়ে নাও

® Both ® and FEVICOL brand are the
Registered Trade Marks of PIDILITE INDUSTRIES PVT. LTD., Bombay 400 021

OBM/2360 BEN.

সমুদ্রের শোঁ-শোঁ গর্জন। উথাল-পাথাল ঝোড়ো হাওয়া। সেই মিউজিক যেন বলছে, মা আমি শিগগিরই ফিরে আসব। তুমি ভেবো না। বাবাকে আবার খুঁজতে বের হয়েছি। হাইতিতি সঙ্গে আছে—ভেবো না। মা, মানুষের বাবা না থাকলে কিছু থাকে না মা।

॥ দুই ॥

সামনের দ্বীপগুলি বড় নির্জন। শুধু বালির ঢিবি। মাইলখানেক কিংবা তারও উপর হবে বড়। গাছপালা নেই। কেবল সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ছে। কিছু সামুদ্রিক কাঁকড়া হেঁটে বেড়াচ্ছে। কিংবা কচ্ছপ রোদে পিঠ দিয়ে ঝিমুচ্ছে। একটা দ্বীপে পাথরের দেয়াল খাড়া উঠে গেছে অনেক উঁচুতে। তারপর দ্বীপের দিকে ধীরে ধীরে নেমে গেছে। এখানেও কেউ নেই মনে হল ম্যাগুলার। অজস্র পাখি উড়ছে, পাহাড়টার মাথায় অন্য দ্বীপগুলিতে তাও নেই। পাখি থাকলে কেন জানি ম্যাগুলার মনে হয় মানুষও আছে। সে হাইতিতিকে নিয়ে দ্বীপটায় নেমে পড়ল।

বেলা হয়েছে বেশ। স্নান-খাওয়া দরকার। হাইতিতিকে নিয়ে সে সমুদ্রে নেমে স্নান করল। বাতাসে জামা-প্যান্ট শুকিয়ে দ্বীপটার কিনার ধরে হাঁটতে থাকল। জাহাজের ভাঙা মাস্তুল কিংবা ডেরিকের কোনো ভাঙা অংশ যদি চোখে পড়ে। কারণ, সে তার বাবার কাছে গল্প শুনেছে, ঝড়ে পড়ে গেলে জাহাজকে কোনো ডাঙার দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। সে এতটা এসেও এমন কিছু দেখতে পায়নি, যা থেকে অনুমান করতে পারে জাহাজডুবি এই অঞ্চলে কখনও কোথাও ঘটেছিল। তবে সে দেখেছে, দ্বীপটার একপাশে কিছু জড়ো করা। উপর থেকে বুঝতে পারেনি, নীচে নেমে বুঝল, উপর থেকে যা খুব কাছে মনে হয়, নীচে নামলে তা দূরে সরে যায়। কিন্তু সে জানে সমুদ্রের ধারে ধারে হেঁটে গেলে ঠিক ও-জায়গাটায় হেঁটে যাওয়া যাবে। সে কিছু কচ্ছপের ডিম পুড়িয়ে নিয়ে গেল। কিছু ক্যাকটাস দেখতে পেল। লাল-নীল রঙের ফুল ফুটে আছে ক্যাকটাসে। আর তাদের অদ্ভুত সব গড়ন! একটা ক্যাকটাস দেখে সে দৌড়ে গেছিল। যেন এইমাত্র কেউ একটা তাদের জন্য আনারস ফেলে গেছে। সে হাতে নিয়ে বুঝল, আনারস নয়। আনারস হলে গা থেকে সবুজ ডালপালা বের হবে কেন! লাল ফুল ফুটে থাকবে কেন গায়ে! পকেট থেকে ছোট্ট ছুরি বের করে নিয়ে ওটি কেটে দেখল। মুখে দিয়ে দেখল। বিস্বাদ নয়। খাওয়া যায়। চাক চাক করে হাইতিতিকে দিতেই পরম আনন্দে সে ভোজে বসে গেল।

হাইতিতির এই এক খারাপ স্বভাব। সিলভার ওকের নীচে বেঁধে রাখলে মুখে অরুচি। আর সঙ্গে নিয়ে বের হলে কেবল খাবে আর খাবে। হাইতিতি সঙ্গে থাকলে তার কোনো ভয় থাকে না। জাদুকরের পালকের টুপি মাথায়। হাইতিতিরও গলায় রুপোর ঘণ্টা—তাদের তো কেউ দেখতে পাচ্ছে না। অথচ কী মজা, তারা সব দেখতে পাচ্ছে!

যেমন বালির প্রান্তরে অদ্ভুত সব ক্যাকটাস। কোনোটা কুমড়োর মতো, কোনোটা আনারসের মতো, আবার কোনোটা গোল গোল—গম্বুজের মতো লম্বা। অজস্র ধারালো কাঁটা। হাইতিতি নেমেই খুব একটা ছুটতে পারছিল না বলে মুখ গোমড়া করে রেখেছিল। বোধহয় আনারসের মধ্যে ক্যাকটাসগুলো খেতে

খুব সুস্বাদু। লেজে ভর দিয়ে এত তৃপ্তির সঙ্গে না হলে খায় কী করে! খেয়ে খুব তৃপ্তি পাচ্ছে দেখলেই বোঝা যায়। তখন হাইতিতির চোখ বুজে আসে। এমনকী বলা যায় না ঘুমিয়েও পড়তে পারে।

ভারী সুন্দর চারপাশটা। কালো পাথরের পাহাড়ের ওপাশে সূর্য।পাহাড়ের ছায়ায় লম্বা হয়ে সমুদ্রের কাছে, চলে এসেছে। সে তাড়া লাগাল। কে জানে সাদা রঙের ওগুলি বালিয়াড়ির ধারে যে পড়ে আছে জাহাজের খোল-টোল হতে পারে। বাবার জাহাজটা তো সাদা রঙের ছিল। বলা যায় না হতেও পারে। জাদুকর তাকে পালক দিয়েছে, বাবাকে জাদুকর বের করে দেবে বিশ্বাসই করতে পারে না। মা-টা যে কী অবুঝ! আচ্ছা, আমি যদি উড়ে যাই তবে ধরতে পারে আমাকে। আমি যদি একটা তিমি মাছের পিঠে বসে টিফিন সারতে পারি—আঃ কী মজা, ভাবা যায় না। তারপরেই হাইতিতিকে বলল, "হয়েছে বাছা, এবার চলো। পরে খাবে।" বলেই পালকের টুপিটা এঁটে দিল বিনুনিতে। হাইতিতির গলায় সাদা রুপোর ঘণ্টা বেঁধে দিল, তারপর উড়ে সেই সাদামতো জায়গাটায় গিয়ে দেখল, আসলে, নুন জমে সাদা হয়ে আছে জায়গাটা। নুনের ঢিবি। এবং আশ্চর্য, সে একটা মানুষের পায়ের ছাপও দেখতে পেল। এইমাত্র কেউ এসে এখান থেকে নুন নিয়ে গেছে যেন।

এই প্রথম সে নির্জন দ্বীপগুলোর একদিকে মানুষের পায়ের ছাপ দেখতে পেল। বাবার জাহাজের রুট সে বাড়িতে দেখেছে। এই দ্বীপগুলি পড়ে রুটে। কাগজের খবর, দ্বীপগুলির কাছে কোথাও জাহাজডুবি হয়েছে। যদি তাই হয় তবে কেউ তাদের একদল এখনও বেঁচে আছে। সে এবারে হাঁটু গেড়ে বসল প্রার্থনার ভঙ্গিতে। তারপর হাইতিতিকে পাশে বসাল। বলল, "হে যিশু, লোকটা যেন আমার বাবা হয়।"

দ্বীপটায় এখন কত রকমের ফড়িং প্রজাপতি উড়ছে। তার উপরে উড়ছে অজস্র ছোট-ছোট পাখি। ওরা প্রজাপতি, ফড়িং ধরে খাচ্ছে। না, কোনো বড় গাছপালা নেই। জীবনের চিহ্ন বলতে এই ফড়িং, প্রজাপতি, আর পাখি। আর ঢেউয়ের সঙ্গে উড়ে এসে আছড়ে পড়ছে উড়ুক্কু মাছ। রুপোলি ছুরির মতো বিছিয়ে থাকে। আবার ঢেউ এলে ভেসে চলে যায়।

একটা বড় ক্যাকটাসের পাশ দিয়ে ওরা পাহাড়টার দিকে হেঁটে যাচ্ছে। উড়ে যেতে পারত। কিন্তু, এইসব বড় বড় ক্যাকটাসের নীচে যদি মানুষটা দাঁড়িয়ে থাকে, এই ভেবে হেঁটে যাওয়া। অবশ্য সে জানে, তখন পালকের টুপিটা খুলে রাখতে হয়। পকেটের মধ্যে সে ভরে রেখেছে। রুপোলি ঘণ্টার ফাঁস ঝুলিয়ে দিলে আর ওড়া যায় না। মানুষের যে কী বাতিক, সে বলতেই পারে না, জাদুকর যা পারে তোমরা তা পারবে কেন। সে ইচ্ছে করলে, সবার সামনে এটা পরে দেখাতেও পারে। তা হলেই মামা বুঝত, সে মিছে কথা বলছে না। কিন্তু জাদুকর বসন্তনিবাস যে বলে গেছে, কেউ জানতে পারলেই পালকের গুণ নষ্ট হয়ে যাবে। রুপোলি ঘণ্টা উড়ে যাবে বাতাসে। কেবল সে আর হাইতিতিই টের পেয়েছে, মানুষের ইচ্ছার শেষ নেই। সে ইচ্ছে করলে কী না পারে।

তখনই মনে হল, মানুষের পায়ের ছাপ তো! না অন্য কিছু!

হাইতিতি ছুটছে। পাহাড়টার চাতাল এখানে লম্বা হয়ে পড়ে আছে। কী মসৃণ পাথর। পা পিছলে যাবার মতো। হাইতিতি

ছাড়া পেয়ে তার কথা শুনছে না। সে একবার নীচে নেমে যাচ্ছে, আবার উপরে উঠে যাচ্ছে। একবার ডেকে ম্যাণ্ডেলা বলল, "এই হতভাগা, তুই কি শেষে হড়কে গিয়ে পা-ফা ভেঙে একটা কেলেঙ্কারি বাধাবি !"

আর এ-সময় সে দেখল, ঠিক পাহাড়ের চাতালটার মাথায় লম্বা একটা কোটা দিয়ে কী পেড়ে আনছে কেউ। সে অবাক। এত উঁচুতে উঠে লোকটা কী করছে। সে তখনই টুপিটা পরে নিল, গলায় হাইতিতির ঘণ্টা ঝুলিয়ে দিল, তারপর উপরে উঠে ভেসে ভেসে দেখল, পাহাড়ের উলটো পিঠের খাঁজে হাজার হাজার পাখির বাসা। চড়ুই পাখি কিংবা মুনিয়া পাখিদের মতো দেখতে। লোকটা পরে আছে আলখাল্লার মতো পোশাক। লম্বা জয়েব সব জামার নানা জায়গায়। তার মধ্যে কোটার ডগায় বর্শার মতো বাসা গেঁথে ঝুঁকে তুলে আনছে। নীচে পড়ে গেলেই অতল খাদ। মানুষটার মৃত্যুভয় পর্যন্ত নেই।

সে পাখির মতো বাতাসে ভেসে খুব কাছে নেমে গেল। মানুষটা কেমন আদিম আর বন্য। বাবার মতো নয়। কিংবা সে বুঝতে পারছে না আসলে এই মানুষটাই তার বাবা কি না ! একটা দ্বীপে থেকে বন্য হয়ে যেতেই পারে ! বড়-বড় নখ হাতে। মাথায় লম্বা চুল। নাক চোখ কপাল বাদে লোকটার আর কিছুই দেখা যায় না। সে অবাক, লোকটা এত উঁচুতে উঠলই বা কী করে ! আর প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে ছোট-ছোট পাখির বাসাই বা মাছ গেঁথে তোলার মতো সংগ্রহ করছে কেন ! হাইতিতির যদি কাণ্ডজ্ঞান থাকে কিছু ! সে এক ফাঁকে মানুষটার পাশে গিয়ে বসে পড়ে নিজেও ব্যাপারটা দেখছে। ওর দুষ্টুমির শেষ নেই। ঠেলা মেরে লোকটাকে ফেলেও দিতে পারে। সে কাছে গিয়ে হাইতিতির কান ধরে ধমক লাগাল, "তুমি এখানে কেন ! এসো।

ওকে নিতে দাও। ও যদি তোমার ঠেলা খেয়ে পড়ে যায়! তুমি যা চঞ্চল!"

আর তখনই লোকটা কেমন হকচকিয়ে পাথর থেকে গড়িয়ে পড়েছিল আর কি! কেমন ভুতুড়ে মনে করছে সব কিছু। ম্যাণ্ডেলার ভারী মজা লাগে তখন। তাকে কেউ দেখতে পায় না। অথচ তার কথা শুনতে পায়। এমন একটা নির্জন দ্বীপে মানুষের কণ্ঠস্বরে লোকটা ভ্যাবাচাকা খেয়েই যেতে পারে। যাক পড়ে যায়নি। হাতে আঠার মতো কী লাগিয়ে রেখেছে। পায়েও বোধহয়। মোমের মতো চকচক করছে। কিছুটা পড়ে গিয়েই আবার উঠে আসতে থাকল।

ম্যাণ্ডেলার এ-সব সময়ে কেমন মায়া হয় মানুষের জন্য। লোকটার হয়ে যদি সে সাহায্য করতে পারে। বলা যায় না, দাড়ি-গোঁফ কামালে মানুষটার আসল চেহারা বের হয়ে পড়বে। একটা ক্ষীণ আশা তার বুকের মধ্যে তোলপাড় করতে থাকল। সে আর কথা বলল না। ইশারায় হাইতিতিকেও তুলে নিয়ে গেল। ফিসফিস করে বলল, "ওদিকটায় ঘুরে ফিরে দেখো। এমন মজার ঘটনা আমার সঙ্গে না বের হলে দেখতে কী করে!" তারপর সে মানুষটাকে সাহায্য করার জন্য পাথরের খাড়া দেয়ালের কাছে উড়ে যেতেই পাখিগুলি কিসের গন্ধ পেয়ে উড়ে যেতে থাকল। আসলে সে কচ্ছপের ডিম পুড়িয়ে খেয়েছে। তার গন্ধ মুখে লেগে আছে। সে পটাপট পাহাড়ের খাঁজে ঝুলে থাকা ছোট ছোট বাবুইয়ের বাসার মতো কটা তুলে নিয়ে আসতে গিয়েই দেখল লোকটা এবারে সত্যি হড়কে পড়ে যাচ্ছে।

ম্যাণ্ডেলাও সাঁ করে উড়ে নীচে নেমে দেখল, লোকটা অত উপর থেকে পড়ে গিয়ে মূর্ছা গেছে। তার খেয়াল নেই, বাসা

কটা তার হাতে থাকলে, লোকটা তো ভিরমি খেতেই পারে। পাখির বাসা যদি বাতাসে ভেসে বেড়ায় তবে মানুষ আহাম্মক হয়েই যেতে পারে। আহা রে! সে কাছে গিয়ে বলল, "এই আমি ম্যাগুেলা। ভয় কী? আমার বাবা জাহাজডুবিতে নিখোঁজ। তাকে খুঁজতে বের হয়েছি। তুমি আমার বাবা নও তো!"

তারপরই ম্যাগুেলার মনে হল, ধুস্ এ তার বাবা হয় কী করে! শনের মতো সাদা চুল, সাদা বরফের মতো দাড়ির রঙ। এ তো একটা বুড়ো মানুষ। চোখের ভুরু পর্যন্ত সাদা হয়ে গেছে। তার বাবা কী সুন্দর দেখতে! আপেলের মতো গায়ের রঙ। চওড়া বুক। একজন সত্যিকারের পুরুষ মানুষ। আর বাবা সমুদ্র থেকে ঘুরে এলে আরও বেশি সুপুরুষ হয়ে যেতেন। গায়ে তাঁর তখন সমুদ্রের গন্ধ লেগে থাকত। তখন সে বাবাকে ছেড়ে কোথাও যেত না। তার জন্য কত রকমের উপহার। সকালে প্রাতরাশ খাবার সময় মুখোমুখি বসলে বাবা কেমন ছেলেমানুষের মতো তার মাথার চুল এলোমেলো করে দিয়ে চুমু খেতেন। সে যা চাইত বাবা তাই নিয়ে আসতেন।

"বাবা আমার চাই, তিনঠেঙে রাক্ষস।" বাবা নিয়ে এলেন।

"বাবা আমার চাই বাদামি পালকের টুপি।" বাবা তাই নিয়ে এলেন।

"বাবা আমার চাই পাপুয়ার রাজপুত্র।" বাবা তাই নিয়ে এলেন।

"বাবা আমার চাই সিংহলের কাঠের হাতি।" বাবা তাই নিয়ে এলেন।

"বাবা আমার চাই ময়ূরের পালক।" তাও নিয়ে এলেন।

"আমার চাই দুষ্টু হাইতিতি।" বাবা জ্যান্ত একটা ক্যাঙারুর বাচ্চা নিয়ে এসে বললেন, "এই তোমার দুষ্টু হাইতিতি।" তারপরই বাবার আবার সফর। জাহাজডুবি। বাবা নিখোঁজ।

না, এ লোকটা একজন বুড়োমানুষ! এর খোঁজে সে জাদুকরের পালকের টুপি পরে বাড়ি থেকে পালায়নি। ম্যাগুেলা ইশারায় হাইতিতিকে ডাকল। এটাকে সঙ্গে আনাও ঝকমারি। আবার সেই পাহাড়ের টিলাটায় বসে ঝুঁকে দেখছে বুড়োমানুষটা এবং সে কী করছে! ডাকলেই যে আসবে কথা নেই। তার বড় লুকোচুরি খেলার স্বভাব। কান ধরে টেনে না নামালে নামবে না। সে সাঁ করে উপরে উঠে কান ধরতেই পাজিটাও সাঁ করে নেমে গেল সমুদ্রের ঢেউয়ের মধ্যে।

ম্যাগুেলা চিৎকার করে উঠল, "তুমি মরবে এবার। দেখছ নীচে কী ভেসে আছে! রাক্ষুসে অতিকায় হাঙর। হাঁ করে আছে। টুপ করে গিলে ফেলবে।" একটা কালো রঙের বীভৎস লম্বা থাম যেন গড়িমসি করে ভেসে যাচ্ছে জলের নীচে। আর তার তলায় ইঞ্চি দুই তিনের মতো লম্বা অজস্র ছোট র‍্যামোরা মাছ। ভারী সেয়ানা! নিজেরা শিকার ধরতে জানে না। হাঙরটা যা খাবে তার থেকে ভাগ বসাবার তালে আছে।

হাইতিতির কানদুটো ভারী লম্বা। এই একটা সুবিধা আছে বলে, ম্যাগুেলা তাকে জব্দ রাখতে পেরেছে। যখন খুশি লম্বা কান ধরে টেনে নিয়ে যাওয়া যায়। হতভাগাটার একটুও যদি মান-সম্মান বোধ থাকে!

ম্যাগুেলা ধমক লাগাল, "এসো। ওখানে যাবে না। বলছি না ওটা রাক্ষুসে মাছ। তোমাকে খেয়ে ফেলতে পারে।"

ঢেউয়ের মধ্যে ঠিক অ্যালবাট্রস পাখির মতো তবু কেমন সাঁতার কাটছে হাইতিতি। হাইতিতিটা কি বোঝে জাদুকরের রুপোলি ঘণ্টা গলায় বাঁধা আছে বলে তাকে কেউ দেখতে পায় না। এমন তো নজির সে এখনও পায়নি। পরখ করেও দেখা হয়নি। মানুষজন দেখতে পায় না সেটা টের পেয়েছে। কিন্তু কুকুর, বিড়াল, কাঠবিড়ালি,

পাখি, জীবজন্তু, তিমিমাছ সবাই তো দেখে ফেলতেও পারে। ঘণ্টা কিংবা পালকের টুপি দেবার সময় জাদুকরের সেটা মনে নাও থাকতে পারে। কেবল মানুষের কথাই তার মনে থাকা স্বাভাবিক। সে বলত, মানুষ বড় হাড়বজ্জাত। মানুষ সহজে কিছু বিশ্বাস করতে চায় না। বিশ্বাস মানুষকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে পালকের টুপিটা মাথায় দিলেই ম্যাণ্ডেলা তুমি বুঝতে পারবে।

ইস, না, আর পারা গেল না। ম্যাণ্ডেলা সমুদ্রের কিছুটা উপরে ভেসে বেড়াচ্ছে বলে দেখতে পায় সব কিছু। হাইতিতির চেয়ে সে বুদ্ধি ধরে বেশি। সে তো মানুষ। সে ধমক লাগাল, "এমন করলে আর কখনও সঙ্গে নিয়ে বের হব না। এসো বলছি। আমাদের ফিরে যেতে হবে। মাকে তো জানো—এতক্ষণে হয়তো পাড়ায় হৈ-চৈ বাধিয়ে দিয়েছে। টিকাকিকে ঠিক বালিয়াড়িতে পাঠিয়েছে, যদি জাদুকরের মূর্তির আশেপাশে কোথাও আমরা লুকিয়ে থাকি। মামাবাবু হয়তো আবার মুখ গম্ভীর করে পুলিশকে খবরটা দিয়েছে। তোমাকে নিয়ে আমার শতেক জ্বালা। আমার মরণ হয় না কেন বাছা।"

হাইতিতিটা তখন উড়োবেড়ালের মতো ঢেউয়ের মাথায় ভাসতে ভাসতে তার কাছে চলে আসে। তারপর দু-হাত জোড় করে থাকে। ম্যাণ্ডেলার সব রাগ জল হয়ে যায়। সে উড়তে যাবে, তখনই মনে হল, আরে মানুষটা তো মূর্ছা গেছে। তার কী হল দেখা হয়নি। সে ভাবে বুড়ো মানুষটাকে ফেলে রেখে এসে ভারী অন্যায় কাজ করেছে। তারপরে সাঁ করে উড়ে, পাহাড় টপকে নীচে নেমে যেতেই দেখল, কেমন ভ্যাবলাকান্তর মতো দু-ঠ্যাঙ ছড়িয়ে বসে আছে বুড়োমতো বন্য মানুষটা। গায়ের আলখাল্লাটা পাতার তৈরি সে এতক্ষণে বুঝতে পারে। কত রকমের লাল-নীল- সবুজ রঙের পাতায় আঠা লাগিয়ে ওটা তৈরি করেছে।

খুব সতর্ক হয়ে পা ফেলে কাছে গেল। লোকটার চোখে শূন্য দৃষ্টি। সে কথা বলতেও পারছে না। ভুতুড়ে ব্যাপার ভেবে সে না আবার একটা দৌড় মারে। ম্যাণ্ডেলা ইশারায় হাইতিতিকেও কিচ-কিচ করতে বারণ করে দিল।

॥ তিন ॥

এই নিয়ে তিন-তিনবার ম্যাণ্ডেলা হাইতিতিকে নিয়ে কোথায় যে উধাও হয়ে গেল! মাথাটা ঠিক রাখতে পারেন না বুচার। পুলিশের লোক কোনো সূত্র খুঁজে পায় না। কতভাবে যে জেরা করেছে। আর যারা জেরা করতে আসে পরে তারাই নিজেরা পালকের টুপি পরে চলে যায়। এমন সুন্দর মেয়েকে এমন কোনো পরি আছে জাদুকর আছে না ভালবেসে থাকতে পারে।

ম্যাণ্ডেলা নিখোঁজ হলে বুচারের যত রাগ গিয়ে পড়ে বেলাভূমির সেই পাথরের মূর্তিটার উপর। যত অনাসৃষ্টির মূলে যেন সে। লতাপাতা-আঁকা জামা পরা সেই জাহাজি লোকটার মতো দেখতে মূর্তিটা কোথা থেকে যে এল! কাদের কাজ! পুলিশ এ-নিয়ে এতটুকু মাথা ঘামায়নি। অথচ ঘামানো দরকার। ষড়যন্ত্র করে কেউ যদি ওটা বেলাভূমিতে ফেলে গিয়ে থাকে। আসলে কোনো অভিসন্ধি।

বোন লুসিকে এ-সব বলা যায় না। ভালয়-ভালয় দু-বারই ফিরে এসেছে ম্যাণ্ডেলা। দু-একদিন না গেলে কিছু বোঝা যাবে না। আর শহরটাও হয়েছে তেমনি। পাহাড়ের নীল উপত্যকা ঢেউ-খেলানো। অজস্র পাইনের জঙ্গল। গভীরে ঢুকে গেলে পিকাকোর পার্ক। আরও দূরে গভীর বন, অজস্র গাছপালা—সবুজ এক অরণ্যে কতরকমের সব পাখি।

বুচার ভাবলেন, তিনি তো তখন খুব

তড়পেছিলেন। হতেই পারে না। সেই লোকটাকে শিশুরা জাদুকর ভাবতে পারে, কিন্তু তিনি জানতেন লোকটা জাহাজে ঘুরে ঘুরে বিশ্রী রোগে উন্মাদ হয়ে গেছে। কিন্তু তিনি স্বচক্ষে যখন দেখলেন, সত্যি সেই অদ্ভুত পোশাক-পরা লোকটাই যেন বেলাভূমিতে জলে-ডাঙায় পড়ে আছে তখন আর মুখে রা নেই। হাত না দিলে বোঝাই যায় না ওটা পাথরের। তাঁর আর মুখ থেকে টুঁ শব্দটি বের হয়নি। মাথায় হুবহু সেই পালকের টুপি। কী যে হয়েছিল তখন তাঁর। মুহূর্তে যেন মনে হয়েছিল, এমন একখানা পালকের টুপি সবারই থাকা দরকার। না থাকলে সে সব হারায়।

মেয়রের কমিটিতে তিনিও আছেন। মূর্তিটাকে শিশুদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য একটা প্রস্তাব পাস হচ্ছে। মূর্তিটাকে বসানো হবে মিনা-করা শ্বেতপাথরের বেদির উপর। সারা বেলাভূমি জুড়ে থাকবে নানারকম ফুলের গাছ। পাখিদের আকর্ষণ করার জন্য একটা ছোট্ট কৃত্রিম মিষ্টি জলাশয় তৈরি করা হবে। এ-সব পরিকল্পনার প্রস্তাবে তিনিও তখন সমর্থন জানিয়েছিলেন। শিশুদের জন্য একজন সত্যি জাদুকরের দরকার মনে হয়েছিল তখন।

মেয়র সমর্থন চাইলে তিনি বলতে পারেননি—এটা একটা কাকতালীয় ব্যাপার। এর উপর গুরুত্ব দেওয়া ঠিক হবে না। ছোটরা যা বলবে, তাই করতে হবে এমন দাবিতে তাঁর সায় নেই বলতে পারতেন। সেদিন তাও পারেননি।

ছোটরাই বলেছিল, বসন্তনিবাস আমাদের। আমাদের জাদুকর বসন্তনিবাস। বেলাভূমিতে আমরা বসন্তনিবাসের সুন্দর মূর্তি দাঁড় করিয়ে রাখতে চাই।

শিশুরা বাড়িতে বলাবলি করেছে, শুধু এই শহরে নয়, পৃথিবীর সব শহরের শিশুরা

স্বপ্ন দেখেছে, সমুদ্রে ভেসে ভেসে চলে যাচ্ছে একখানা মূর্তি। জাদুকর বসন্তনিবাসকে যারা জাহাজঘাটায় বেলুন উড়িয়ে বিদায় জানিয়েছিল, তারাও দেখেছে স্বপ্নটা। মা-বাবারা উদ্ভট বলে একেবারে দূরছাই করতে পারেনি। কারণ মা-বাবাদেরও দরকার কখনও কখনও পালকের টুপি। ফলে সব সদস্যই বাজেট ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও এ-বিষয়ে একমত না হয়ে পারেনি।

কিন্তু তাই বলে সেই জাদুকর এখন ম্যাণ্ডেলার দিকে হাত বাড়াবে! লুসির একটা মাত্র মেয়ে। স্বামী নিখোঁজ। জাদুকরের অন্তত এ-বিষয়টা ভেবে দেখার দরকার ছিল। ছোট্ট মেয়েটাকে কী যে তুকতাক করে গেল, মাঝে মাঝে হাওয়া হয়ে যায়।

॥ চার ॥

বুনো লোকটা ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। কোমরে লেগেছে বোধহয়। কোমরে হাত দিয়ে কেমন বেঁকে রয়েছে কিছুটা। পাখির বাসাগুলো এখানে-সেখানে ছিটকে পড়েছে। ম্যাণ্ডেলার বড় মায়া মানুষের জন্য। সে মানুষের কোনো দুঃখই সহ্য করতে পারে না। বাসাগুলি যে মানুষটার অনেক কষ্টে সংগ্রহ করা দেখলেই বোঝা যায়।

সে ওগুলো তুলে সংগ্রহ করে দিতে পারে। পাথরের ঢালু জায়গা দিয়ে লোকটা ভাঙা কোমর নিয়ে আর উঠতে পারবে না। লোকটা আর কোথাও কোনো শিশুর কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে না। মনের ভুল। সে ভাবল, কতকাল আগে, যেন গত জন্মে সে সহসা হাজির হয়েছিল। শিশুদের কথা, চার শিশুর, না সে আর শিশু নেই—সেই কবেকার কথা যেন সব—সব ভুলেই গেছিল, কে আবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছে তাকে পৃথিবীটা শিশুদের জন্য। যা কিছু

সব তাদের বড় হওয়ার জন্য। সে কেমন বুকে এবং শরীরে বল পেতে থাকল। প্রথমে অবাক হয়েছিল, বাতাসে পাখিগুলির বাসা ভেসে বেড়াতে দেখে। খুবই ভুতুড়ে ব্যাপার। পরে কিচ-কিচ শব্দ—যেন একটা জন্তুর সঙ্গে কোনো শিশু ফিসফিস করে কথা বলছে। দ্বীপটায় এতদিন আছে কখনও সে এমন তাজ্জব ভুতুড়ে ঘটনা প্রত্যক্ষ করেনি। পা হড়কে যাবারই কথা। মনের ভুলও হতে পারে। সে আবার কষ্ট করে বাসাগুলোর দুটো একটা তুলে নেবার চেষ্টা করছে।

ম্যাণ্ডেলা বাতাসে ভেসে গিয়ে লাল ক্যাকটাসের নিচু থেকে একটা পাখির বাসা তুলে নিল। লোকটাকে সবকটা সংগ্রহ করে দেওয়া দরকার। তার কথা শুনে ভয় পাবারই কথা। একটা অপরাধ করে ফেলেছে বুড়োমানুষটার কাছে। অ মা! একী। লোকটা পড়িমরি করে ছুটছে কেন। একটা পাখির বাসা যদি বাতাসে ফের ভেসে পেণ্ডুলামের মধ্যে দুলতে দুলতে এগিয়ে আসে তবে বুড়োমানুষটা মাথা ঠিক রাখে কী করে!

ম্যাণ্ডেলার হাতে পাখির বাসা। ম্যাণ্ডেলা লোকটাকে ধরার জন্য বাতাসে ভেসে যেতে থাকল। সাঁতার কাটছে। বুড়ো মানুষটা পেছনে আর তাকাচ্ছে না। সমুদ্রের দিকে না গিয়ে পাথরের দেয়ালের মধ্যে কেমন সহসা অদৃশ্য হয়ে গেল। ম্যাণ্ডেলা পাথরের দেয়ালটার কাছে যেতেই দেখল একটা সরু, পাতলা কাঠের মতো এখানে দেয়ালটা দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক দরজার পাল্লা আধ-ভেজানোর মতো। ম্যাণ্ডেলা ওটা ধরে বুঝল, পাথরটা ওরকম ভাবেই আছে। ভিতরে ঢুকতে ভয় করছে। তারপরই মনে হল একজন বুড়োমানুষ যখন ওখানটায় অদৃশ্য হয়ে গেছে, সেও যেতে পারবে। তা-ছাড়া তাকে তো কেউ দেখতে পায় না, সে সব দেখতে পায়।

হাইতিতির ও-সব খেয়াল নেই। সে বুড়োমানুষটা পালিয়েছে দেখেই কেমন ভেসে ভেসে ডিগবাজি খেতে থাকল। মাঝে-মাঝে লেজের উপর ভর করে লাফাচ্ছে, দৌড়চ্ছে। সারাদিন বাড়ির ওক গাছটার গুঁড়িতে বাঁধা থাকে। ছাড়া পেয়ে কী যে করবে ভেবে পাচ্ছে না। বেশ দূরে, যেন সে দ্বীপটায় একাই বেড়াতে এসেছে। ম্যাণ্ডেলার কথাও তার মনে নেই। বোঝে না, তার সঙ্গে না থাকলে যে-কোনো সময় হারিয়ে যেতে পারে।

ম্যাণ্ডেলা ডাকল, "হাইতিতি, শিগ্‌গির আয়, লোকটা পাহাড়ের ভেতর কোথায় পালিয়েছে। খুঁজে বের করতে হবে।"

বুড়োমানুষটাকে সব বুঝিয়ে বললে বিশ্বাস করবে। মামা তাকে বিশ্বাস করে না। মাও করে না। বলতেও পারে না এই দেখো পালকের টুপি, এই দেখো পালকের টুপি পরলে আমাকে আর দেখা যায় না। এই দেখো এবারে কেমন ঘরের মধ্যে ইচ্ছেমতো ভেসে বেড়াতে পারছি। এ-সব বললেই জাদুকর বলে গেছে, পালকের টুপির গুণ নষ্ট হয়ে যাবে। রুপোলি ঘণ্টা আর বাজবে না। মানুষের মধ্যে জানাজানি হয়ে গেলে মন্ত্রগুণ আর থাকে না। সে মামাকে বোঝাতে পারে না বলে এটা তার রোজকার দুঃখ।

সে এবার হাইতিতিকে নিয়ে ভিতরে ঢুকতেই অবাক। কী সুন্দর একটা সবুজ উপত্যকা। কতরকমের গাছ। কতরকমের সুন্দর-সুন্দর ফুল ফুটে আছে। দ্বীপের মধ্যে এমন একটা নির্জন অরণ্য গোপনে বিরাজ করছে বাইরে থেকে কেউ ভাবতেই পারবে না। লোকটা দিনের বেলায় বোধহয় এখানেই লুকিয়ে থাকে। রাতে বের হয়ে যায়। কিন্তু সে কিছুতেই বুঝতে পারে না মানুষটা জীবনের এত ঝুঁকি নিয়ে কেন

বাসাগুলি সংগ্রহ করছিল !

এবারে ম্যাণ্ডেলা একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে টুপিটা খুলে ফেলল। তারপর বলল, "আমি ম্যাণ্ডেলা। আমাকে তুমি ভয় পাও কেন ! আমার সঙ্গে হাইতিতি আছে জানো !"

বুড়োমানুষটা আর পারছে না। চোখে আতঙ্ক। জ্যান্ত একজন মানুষের বাচ্চা। কথাও বলছে। ঠিক এমনই কণ্ঠস্বর পাহাড়ের মাথায় শুনেছিল। মানুষকে সে বড় ভয় পায়। সে হঠাৎ আবার উঠে পালাতে চাইলে হাইতিতি গিয়ে সামনে দাঁড়াল। হাইতিতির গলার ঘণ্টা নেই। ম্যাণ্ডেলা ওটা তার পকেটে ভরে রেখেছে।

লোকটা বড় বিপাকে পড়ে গেল। এই একটা মানুষের বাচ্চা দেখতে পেয়েছে, সেটা দেখে পালাতে না পালাতে একটা ক্যাঙারুর বাচ্চা। মাথা ঠিক আছে তো ! ভুল দেখছে না তো ! ক'দিন বড় অসুখে কাতর ছিল। আস্তানায় যা পাখির বাসা ছিল জলে ভিজিয়ে তা খেয়েছে। ভারী সুস্বাদু স্যুপ। কেউ যদি একবার এই আশ্চর্য স্যুপের খবর পায়, তবে দ্বীপ ছেড়ে কোথাও আর যেতে চাইবে না। এই স্যুপের খবর পৃথিবীর একমাত্র মানুষ সে জানে। দ্বীপে পাখিরা আসে ডিম পাড়তে। তখন তার কাজ ডিমগুলি ঠিকমতো ফুটছে কি না দেখা। বাচ্চাগুলোর লালন-পালন করা, ঝড়বৃষ্টি থেকে ছানাগুলোকে আত্মরক্ষায় সাহায্য করা। পাখিগুলো তাকে ভয় পায় না। বড় বড় ডানাওলা পাখি। এখন তারা সব তার বন্ধু। শীতকাল বলে আসছে না। গরম পড়লেই আসতে শুরু করবে। দ্বীপে তার যত কাজ। শুশুকের বাচ্চা সমুদ্রের বড় বড় ঢেউ কখনও দ্বীপের উপর ফেলে দিয়ে যায়। সে না থাকলে তারা মরে যেত। সে তাদের আবার গভীর সমুদ্রে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে আসে। পাখিরা জানে বুড়োমানুষটা তাদের বন্ধু। কচ্ছপেরা জানে, বুড়োমানুষটা তাদের বন্ধু। এমনকি চিংড়ির ঝাঁক যখন ডিম পাড়তে আসে পাহাড়ের খাঁজ অঞ্চলে, তখন ছোট-ছোট হাঙরের বাচ্চাদের উৎপাত বাড়ে। আর কত সব মাছ, নাম জানে না সে, রাক্ষুসে ট্রাউট মাছ, স্যালমন মাছ কেবল হাঁ করে থাকে। তার কাজ বসে বসে তাদের তাড়ানো। অসহায় মাছগুলোও বোঝে বুড়োমানুষটা তাদের বন্ধু। ভয় পায় না। দেখলে লেজ নাড়ে। তার ছায়া পড়ে সমুদ্রের নীল জলে। অস্তগামী সূর্যের আভায় যখন দ্বীপের মধ্যে জোনাকি জ্বলে তখন সে তারাদের সঙ্গে কথা বলে।

এমন একজন মানুষের পক্ষে ম্যাণ্ডেলাকে দেখলে ভয় পাবারই কথা। এত বড় দ্বীপটায় একার পক্ষে তার সত্যি সুন্দর বাসোপযোগী জায়গা। কিন্তু এই ছোট্ট মেয়েটা এল কোত্থেকে ! ক্যাঙারুর বাচ্চাটা ! এইমাত্র পাহাড়ের মাথায় সে বসে ছিল,এমনও নয় যে কোনো জাহাজ থেকে তারা নেমে এসেছে। এখানে উঠে আসার পর একটা জেলেনৌকাও সে দেখেনি। কতকাল হয়ে গেছে, সে এই দ্বীপটার গাছপালার মতো একটা সচল বৃক্ষ হয়ে গেছে। সে এবং দ্বীপটা ছাড়া পৃথিবীর আর কাউকে সে চেনে না। নিজেকে ছাড়া মানুষের অবয়বে, সে আর কাউকে দেখতে কতদিন থেকে অনভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। ভুতুড়ে ব্যাপার। সুতরাং তার কাছে যে তিমিমাছের চোয়ালের দন্ত আছে, সেখানে গিয়ে একবার হাঁটু গেড়ে মানত করা দরকার—"দ্বীপের দেবী, তুমি আমাকে অশুভ প্রভাব থেকে মুক্তি দাও।"

ম্যাণ্ডেলা সব টের পায়। লোকটা কী ভাবছে তাও। সে তার সাদা ফ্রক টেনে লোকটার সামনে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল। বলল, "আমি ম্যাণ্ডেলা। আমার বাবা জানো নাবিক ছিলেন। তারপর কী জানো, আমার বাবা আর ফিরে আসেননি। বাবার

জাহাজডুবি হয়েছে। মা যে সেই কেমন হয়ে গেল, হাসে না। মা হাসতে ভুলে গেছে। আমার মামা আছে জানো !"

লোকটা কেবল ঢোক গিলছে। যাবে কোথায় ! সামনে মানুষের অবয়বে, মেয়েটা, পাশে ক্যাঙারুর বাচ্চার অবয়বে আর একটা। পেছনে পাথরের দেয়াল। সে যেখানেই পালাতে গেছে, দেখছে, কী করে এ-দুটো হাজির। এমনও নয় যে তারা তার পিছু-পিছু ছুটছে। পিছু ছুটলে ভয় থাকত না। সে ছোটবার সময় পেছন ফিরে দু-একবার তাকিয়েছে, কেউ নেই। থামলেই দেখেছে একেবারে শরীর ঘেঁষে ওরা দাঁড়িয়ে আছে। ওর সঙ্গে কথা বলছে।

সে আমতা-আমতা করতে থাকল।

আবার যেন মূর্ছা যাবে।

ভয় পেয়ে ম্যাগুেলা বলল, "এই এই, তুমি আবার মূর্ছা যাচ্ছ। তুমি কী গো! আমি একটা ছোট্ট মেয়ে, ছোট্ট মেয়েকে কেউ ভয় পায়। তুমি খবর দিতে পার, এ-দ্বীপে জাহাজের কোনো পাটাতন ভেসে এসেছিল কিনা! ভাঙা মাস্তুল। কিংবা এই ধরো যদি কোনো মানুষ! তুমি এখানে কেন! কী করো?"

লোকটা মূর্ছা যেতে যেতে আবার কেমন জ্ঞান ফিরে পেল। সত্যি তো এমন একটা ছোট্ট মেয়েকে তার ভয় পাবার কী আছে! মূর্ছা যাওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তার চেয়ে বরং মূর্ছা না গিয়ে একটু ধাতস্থ হওয়া যাক।

হাইতিতি হঠাৎ মুখ বাড়িয়ে লোকটাকে শুঁকতে গেল। চাটতে গেল।

"আ! হাইতিতি, কী হচ্ছে।" তারপর লোকটার দিকে তাকিয়ে বলল, "কথা বলছ না কেন। তুমি কি বোবা?"

বুড়োমানুষটা তবু কথা বলছে না। কেবল পিছুচ্ছে। যেন ম্যাগুেলা টের না পায়। কিন্তু মানুষটা কেন বোঝে না, নড়লেই তার পাতার পোশাক ঝমঝম করে বেজে উঠে।. মৌমাছির গুঞ্জনের মতো শব্দটা।

ম্যাগুেলা বলল, "বুড়োমানুষ, তোমার আলখাল্লাটা আমাকে দেবে? কেমন ঝমঝম বাজনা বাজে। আমাদের জাদুকরের ছিল তোমার মতো একখানা আলখাল্লা।

যখন-তখন ইচ্ছে করলে জেব থেকে বের করে আনতে পারত কাঠবেড়ালি, খরগোশ। কবুতর। সাদা রঙের বিড়াল। রেগে গেলে জাদুকরের কান ফরফর করে নড়ত। নাচত। সে কী ভারী মজার বিষয়। কিন্তু জানো, তার পোশাক নড়লে কোনো বাজনা বাজত না।"

এই কথায় কেমন বুড়োমানুষটার মধ্যে পুলকের সঞ্চার হল। তার এই পোশাক নিজের হাতে তৈরি। গিনি পাতার পোশাক। চামড়ার মতো শক্ত। জুড়ন গাছের আঠা শুকিয়ে সরু সুতোর মতো শক্ত হয়ে গেলে সেতারের তারের মতো বাজে। আঠা বড় বাহারি জিনিস। লাগাবার সময় কখন যে কিছুটা পাতার ফাঁকে লম্বা সুতোর মতো টান টান হয়ে শক্ত হয়ে যায়। নড়লে-চড়লে জলতরঙ্গ বাজনা বাজে। যখন রাতে সুমুদ্রের শোঁ-শোঁ গর্জন বাদে কিছু শোনা যায় না, পাখিরা ঘুমিয়ে পড়ে, আকাশের বুকে শুধু জেগে থাকে নক্ষত্রেরা তখন কখনও মনে পড়ে যায় সে বড় একা। তার ভিতরে একটা কষ্ট তিরতির করে বেয়ে ওঠে। সে দুঃখ ভুলে যাবার জন্য কোনো গ্রাম্যসঙ্গীত গায়। পাথরের উপর নাচে। নাচের তালে তার শরীর থেকে জলতরঙ্গ বাজনা ওঠে।

সে এখন অনেকটা ধাতস্থ। ক্যাঙারুর বাচ্চাটা ওর গা ঘেঁষে ভালমানুষের মতো, একজন বিশ্বস্ত সঙ্গীর মতো বসে আছে। মুখ বাড়িয়ে কুকুরের মতো শুঁকতে যাচ্ছে না। অথবা কুঁই-কুঁই করে লেজও নাড়ছে না। পোষা কুকুরের স্বভাব একেবারে। বুড়োমানুষটা মানুষের যে-কোনো স্বাভাবিক আচরণকেই ভয় পায়। তার ধারণা, এ-সবের মধ্যেই সে লুকিয়ে রাখে তার ধারালো ছুরিটা। কখন দেঁতো হাসি হেসে বলবে, "ফায়ার !"

কতদিন পর তার এই শব্দটা মনে হল। ফায়ার। নিরীহ মানুষকে খুন করার নির্দেশ। সে যেন কথাটা মনে করতে পেরে আবার পাগল হয়ে যাবে। এটা হলেও তার নাচতে হয়। নাচলে পাগলের আক্রমণ থেকে সে রক্ষা পায়। জোব্বার ভেতরে থাকে একটা নল। সে সেটা ফুটো করে বানিয়েছে সুন্দর একটা ফ্লুট। পাগলের আক্রমণ ঘটছে টের পেলেই তাড়াতাড়ি সে ফ্লুটটা বের করে নেয়। তারপর ফ্লুটটা বাজায় আর নাচে। এভাবেই সে এতকাল এই দ্বীপটায় তার মস্তিষ্কে যে মাঝে-মাঝে 'ফায়ার' কথাটা শুনলে পাগলের আক্রমণ ঘটে থাকে তা থেকে রক্ষা পায়।

আর ভাবামাত্রই কাজ শুরু হয়ে যায়। বুড়োমানুষটা দাঁড়িয়ে পড়ে। তারপর জোব্বার ভেতর থেকে বের করে আনে লম্বা একটা নল। আঙুলের বড় বড় নখের ভেতর ফ্লুটের ফুটো অদৃশ্য হয়ে যায়। তারপর ম্যাণ্ডেলা দেখতে পায় সুন্দর এক সুর বাঁশিতে বাজিয়ে যাচ্ছে বুড়োমানুষটা। নাচছে। পা তুলে, লাফিয়ে লাফিয়ে নাচছে। কেমন বাহ্যজ্ঞানশূন্য। হাইইতিতি বাজনা শুনে স্থির থাকতে পারছে না। ম্যাণ্ডেলা নিজেও কেমন চঞ্চল হয়ে উঠছে। হাইইতিতি লেজে ভর করে তালে তালে নাচ শুরু করে দিয়েছে। সেও কেমন মিউজিকের সঙ্গে পা তুলছে, পা নামাচ্ছে। বুড়োমানুষটার বোধহয় এখন খেয়ালই নেই তাকে কেউ তাড়া করছিল। ওর আলখাল্লা লোটাচ্ছে। উঁচু-নিচু পাথর থেকে আলখাল্লা ওঠা-নামার সময় মিউজিক আশ্চর্য তরঙ্গ তুলে কেমন আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুলছে। ম্যাণ্ডেলা আর পারছে না। সেও নাচছে। মানুষটা পাহাড়ের খাদ থেকে বের হয়ে নাচছে। লাল ক্যাকটাসের নীচে দাঁড়িয়ে নাচছে। আনারসের ক্যাকটাসগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে পার হচ্ছে। মারিজুনা পাখিরা তখন দলে দলে

উড়ে আসতে থাকল। উড়ে আসতে থাকল শঙ্খচিল, উড়ে আসতে থাকল রবিন পাখির দল। উড়ে আসতে থাকল প্রজাপতি। অ্যালবাট্রস পাখিরা।

ম্যাণ্ডেলা নাচছে। কোনো ক্লান্তি নেই। একজন বুড়োমানুষ একটা নির্জন দ্বীপে এমন সঙ্গীতমালা সৃষ্টি করে যাচ্ছে, কেউ তার সাক্ষী নেই। ম্যাণ্ডেলা ভাবল, বুড়োমানুষটাকে নিয়ে যেতে হবে তাদের ছোট্ট শহরে। এই বাজনা, পাইন-ফেস্টিভ্যালের দিনে বাজাতে পারলে, আবার তাদের সেই জাদুকর বসন্তনিবাসের কথা সবাই মনে করতে পারবে। সে যে অনায়াসে একজন শিশুকে দিতে পারে পালকের টুপি, আর রুপোলি ঘণ্টা, বিশ্বাস করাতে পারবে তবে মানুষজন।

ম্যাণ্ডেলা নাচছে। হাইতিতি নাচছে। ঘুরে ঘুরে নাচছে। বুড়োমানুষটা ফ্লুট বাজাচ্ছে। সেও নাচছে।

ও মা! এ কী তাজ্জব ব্যাপার। সমুদ্রে ওগুলো অতিকায় কী সব ভেসে উঠেছে। মনস্টার! ম্যাণ্ডেলা চিৎকার করে উঠল, "বুড়োমানুষ, দেখো, দেখো কারা এগিয়ে আসছে", বলতে বলতে ম্যাণ্ডেলা মূর্ছা গেল।

বুড়োমানুষটার এতক্ষণে সংবিৎ ফিরে এল।

॥ পাঁচ ॥

বুচার বলল, "দেখো লুসি, তোমাকে একটা কথা বলছি। মন দিয়ে শোনো। আমার বয়স হয়ে যাচ্ছে। আমি আর দৌড়ঝাঁপ করতে পারি না। দু-বার তো দেখলে, তোমাদের ফাঁকি দিয়ে ম্যাণ্ডেলা কীভাবে ভেগে পড়ে। ওয়াকাকে আর ভেড়ার পাল সামলাতে পাঠাবে না। ওয়াকার মা যেমন বাড়ির কাজকর্ম করে, ওয়াকা তেমনি ম্যাণ্ডেলাকে লক্ষ রাখবে।

লুসির কান্না-কান্না মুখ। এটা অবশ্য এখন নয়। যখন খুব ছোট ছিল লুসি তখন ও একটুতেই বিচলিত হয়ে পড়ত। এজন্যই বোধহয় তার এই ছোট্ট বোনটাকে সারা জীবন ধরে দুর্যোগের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। কেমন বোকাগোছের। বোকাগোছের বলবেন, না ভালমানুষ বলবেন বুঝতে পারছেন না। মাঝে-মাঝে তিনি বোনের প্রতি খুবই খেপে যান। একজন জাহাজি মানুষকে বিয়ে করাতেও খেপে গিয়েছিলেন। তবে রাগ বেশিদিন পুষে রাখতে পারেন না। নির্বোধ বোনটার জন্য তার বড় কষ্ট। নিজে বিয়ে-থা করলেন না। ম্যাণ্ডেলা আর এই লুসিই তার সব কাজকর্মের প্রেরণা। গতবার ম্যাণ্ডেলা ফিরে এলে চুপি-চুপি লুসিকে বলেছিলেন, "শোনো, এখন থেকে ওকে রাতে ঘরে আটকে রাখবে। ঘরের বাইরের ছিটকিনি তুলে রাখবে।"

বুচার বললেন, "সকালে কী দেখলে?"

"দরজা খোলা। ম্যাণ্ডেলা নেই।"

"ছিটকিনি বাইরে থেকে বন্ধ করেছিলে?"

"করেছিলাম।"

"ঠিক করেছিলে কিনা ভেবে দেখো।"

এখানেই যত গণ্ডগোল লুসির। দাদার ধমক খেলে মাথা কেমন গুলিয়ে যায়। সব আর ঠিক-ঠিক মনে করতে পারে না!

"করেছিলে?"

"আমার তো মনে হয় করেছি।"

"লুসি, কী বলব তোমাকে! দু-বারেও শিক্ষা হয়নি। বলছ কিনা মনে হয় করেছ। এটা একটা কথা হল! পুলিশ শুনলে কী বলবে! বলবে না আগে ঘর সামলান মশাই, পরে এস আই আর করবেন।"

গতবারও বুচার চেয়েছিলেন, বোন আর ভাগ্নিকে পাশের উপত্যকায়, যেখানে তিনি থাকেন, সেখানে নিয়ে তুলবেন। কিন্তু লুসি রাজি না। জাহাজি মানুষটা পৃথিবী ঘুরে ঘুরে কত সব দুর্লভ গাছপালা এ-বাড়িটাতে

যদি আপনি অন্য সাবানেরও ভেতর-বাইরে দেখতে পেতেন!

পিয়ার্স সাবানের বিশুদ্ধ রত্নের মত স্বচ্ছতাই দেখিয়ে দেয়, আপনার কেনা অন্য কোনো সাবানের চেয়ে এটি কত ভিন্ন ধরণের।

পিয়ার্স—এক অতি বিশুদ্ধ সাবান, এতে এমন কোনো মিশ্রণের সংযোজন করা হয় না যা আপনার মোলায়েম ত্বকে কোনোরকম ক্ষতি পৌঁছতে পারে।

পিয়ার্স সাবানে কোনো কর্কশ ধরণের উপাদান থাকে না। ত্বকে অস্বস্তি আনতে পারে এমন কোনো সুগন্ধ বা রঞ্জক, বা ফেনা তৈরী করার কোনো কৃত্রিম উপাদান মেশানো হয় না।

তাই আপনি আপনার ত্বকে অনুভব করেন এক ঝরঝরে পরিষ্কার আর তরতাজা ভাব, অথচ কোনোরকম শুকনো "টানটান" ভাব থাকে না।

সেজন্যেই তো, এত বছর পরেও, আজও আমরা পিয়ার্স সাবান তৈরী করি সেই একই পদ্ধতিতে।

আজও এটি তৈরী করতে আমরা ব্যবহার করি, স্বাভাবিক তেল, আসল গ্লিসারিন আর সেই একই মৃদু কোমল সুগন্ধ।

আজও আমরা প্রতিটি সাবান, পরিপক্ক ক'রে তোলার জন্যে দশ সপ্তাহ ধরে রেখে দিই, যাতে বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে প্রয়োজনীয় সুষমতা আসে।

আর তাই, আমাদের এত যত্নের ফলে আজও আপনি এর চেয়ে বেশী বিশুদ্ধ অন্য কোনো সাবান কিনতেই পারেন না।

অন্য সাবান হয়তো এর চেয়ে সস্তা হতে পারে, কিন্তু আপনার কোমল ত্বকের জন্যে তো একমাত্র পিয়ার্স-এর কোমলতারই প্রয়োজন, তাই না?

পিয়ার্স সময়ের ছায়া পড়তে না দিয়ে আপনার ত্বকের গ্লানিহীন তারুণ্য বজায় রাখে।

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

LINTAS PS 61 1913 BG

বড় করে তুলেছে। সে নিখোঁজ। কিন্তু গাছগুলিও তো আছে। লুসি এর সান্নিধ্যে কেমন তার স্বামীর অতীত স্নেহ-ভালবাসা খুঁজে পায়।

বুচারও যে সেটা বোঝেন না তা নয়। তিনিই কি রাজি হবেন তার বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও থাকতে! একটা বাড়ি তো আর মানুষের শুধু বসবাসের জায়গা নয়—তার সঙ্গে কতরকমের স্মৃতি জড়িত থাকে। বললেই আর বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়া যায় না। তবে মানুষ তো তবু ঘরবাড়ি ছেড়ে যায়—সেখানে নতুন কোনো আগ্রহ জন্মানোর অবকাশ থাকে। জাহাজি মানুষটা যেমন নিজের হাতে বাড়িটাকে সাজিয়েছে, তিনিও তেমনি, নিজের পছন্দমতো বাড়িটার চারপাশে গাছপালা থেকে ফুলের গাছ সব লাগিয়েছেন। তিনিই বা নিজের বাড়ি ছেড়ে বোনের বাড়িতে চলে আসেন কী করে! দ্বিতীয়বার ম্যাণ্ডেলা ফিরে আসার পর প্রতি রাতে ঘুমোতে যাবার আগে ফোন করতেন, "লুসি।"

"হ্যাঁ দাদা, আমি।"

"দেখেছ?"

"দেখেছি।"

মাস দুয়েক যাবার পর বুচারের নিজেরই শেষে মাঝে-মাঝে ভুল হয়ে যেত। মাঝরাতে ঘুম ভাঙলে মনে হত, আরে লুসিকে তো জিজ্ঞেস করা হয়নি, তাড়াতাড়ি টেবিল থেকে ফোনটা তুলে মাঝ রাতেই প্রশ্ন, "দেখো, দেখে নাও।"

লুসি জানে, মাঝরাতে একমাত্র দাদাই তাকে ফোন করতে পারে। সে তবু উঠে যেত। ম্যাণ্ডেলা ছোট্ট পরিষ্কারমতো সাদা বিছানায় ঘুমিয়ে আছে দেখতে পেত। কারণ দেখে না এসে বললে তিনি বিশ্বাসই করবেন না।

তারপর যা হয়, সময় যায়। কড়াকড়ি কমে। লুসি আজ সত্যি মনে করতে পারছে, না সে কাল ম্যাণ্ডেলা ঘুমিয়ে পড়লে ছিটকিনি তুলে দিয়েছিল কি না। মেয়েও হাড়-বজ্জাত। কাউকে পাশে শুতে দেবে না। সঙ্গে একঘরে থাকতে দেবে না। তার নাকি কোনো ভয়ডর নেই। জাদুকর বসন্তনিবাস যার বন্ধু তার পক্ষে কোনো ভয় থাকার কথা নয়।

বুচার বললেন, "যাকগে, আমি ভাবছি ম্যাণ্ডেলা ফিরে এলে কোনো কনভেন্টে দিয়ে দেব।"

"না না দাদা। ওখানে ও আরো বেপরোয়া হয়ে যাবে। ও চলে গেলে আমি ভারী একা হয়ে যাব।"

তারপরই বুচার কেমন চঞ্চল হয়ে উঠলেন। আসলে খেপে গিয়ে তিনি কনভেন্টের কথা তুলেছেন। নিজেও বুঝতে পারছেন না ম্যাণ্ডেলাকে নিয়ে কী যে করা যায়! স্কুলে ওয়াকা দিয়ে আসে। হাত ধরে। ওয়াকার মা বিকেলে নিয়ে আসে। তারপর খেলতে যায় বেলাভূমিতে। তখনও ওয়াকা পাহারায় থাকে। এত চোখে-চোখে রাখাও তো কঠিন সমস্যা।

তারপর বুচার ভাবলেন, ম্যাণ্ডেলা সত্যি যদি একবার ফিরে না আসে। মাথাটা তারও কেমন করছে। তিনি বেতের চেয়ারটায় বসে পড়লেন। দেখলেন ম্যাণ্ডেলা সামনে যেন দাঁড়িয়ে আছে। বলছে, "মামা, সে কী মজা বুঝবে না! মানুষ কতদিন থেকে বাতাসে ভেসে যেতে চেয়েছে। কত কিছু বানিয়েছে মানুষ। তবু বাতাস কেটে সাঁতার কাটা যায় না। ভাবো তো, তুমি বাতাস ফুঁড়ে চলে যাচ্ছ—যেখানে খুশি যেতে পারছ!"

হঠাৎ বুচার বলে উঠলেন, "থাম, থাম বলছি।" আরে কার সঙ্গে কথা বলছেন! আসলে গতবার ম্যাণ্ডেলা ফিরে এসেছে খবর পেয়েই ছুটে এসে দেখেছিলেন, সে ছড়া কেটে সিলভার ওক গাছটার চারপাশে

বোঁ-বোঁ করে ঘুরছে। আর আশ্চর্য, ছড়াটায় ছিল সিমন বলে এক ব্যক্তির নাম। সে সিমন না বলে ম্যাজিসিয়ান বলছে। এতে তাঁর খুবই রাগ বেড়ে গেছিল। জাদুকর সত্যি মেয়েটির মাথা খেয়েছে। উঠে গিয়ে তিনি ম্যাগুেলার হাত চেপে ধরেছিলেন। বলেছিলেন, "ওহ্, নো, নো। ম্যাগুেলা তুমি ভুল বলছ। ম্যাজিসিয়ান হবে না। সিমন হবে। সিম্পল সিমন!"

কিন্তু ম্যাগুেলার মনে ঘুরে আসার এক আশ্চর্য রেশ এখনও জেগে আছে। সে শুনবে কেন মামার কথা! তার তো এখন মনে হচ্ছে সব মানুষই চায় খোকা-খুকির মতো উড়ে বেড়াতে। চাই একজন শুধু জাদুকর। তাঁকে আগে ম্যাগুেলা যমের মতো ভয় পেত। মনে হচ্ছে তিনি আর তার মামা নন। একটা স্পনজ। সব মামারাই তাই। এক বড় আশ্চর্য পৃথিবীর খবর তার কাছে আছে। সে মামার আর্তনাদ গ্রাহ্য করল না। সে আগের মতোই সিমন না বলে ম্যাজিসিয়ান বলে যেতে থাকল।

কথা শুনছে না ম্যাগুেলা। সেই উন্মাদ লোকটাকে কাছে পেলে তিনি যেন তার চিকিৎসা না করে জেলে পুরে দিতেন। বাচ্চাদের এভাবে মাথা খাওয়া তো দণ্ডনীয় অপরাধ। তিনি রেগে কাঁই। তার খেয়ালই হয়নি, উত্তেজনার বশে তিনি মাথার টুপি খুলে রাখতে ভুলে গেছেন। সমুদ্র থেকে ঠাণ্ডা বাতাস এসে সেই টুপিটাও কখন উড়িয়ে নিয়ে গেল। আর আশ্চর্য, বাতাসে টুপিটা উড়তে উড়তে চলে যাচ্ছে এগমন্ট পাহাড়ের দিকে।

ম্যাগুেলা হাতে তালি বাজিয়ে বলেছিল, "মামার টুপি জাদুকর নিয়ে পালাচ্ছে।"

॥ ছয় ॥

ম্যাগুেলা মূর্ছা যেতেই বুড়ো মানুষটার নাচ থেমে গেল। তার জোব্বা থেকে যে বাজনা বাজছিল থেমে গেল। পাখিরা উড়ে যেতে থাকল সমুদ্রে। সানফিশের ঝাঁক বাজনা শুনে সমুদ্রে যারা ভেসে আসছিল তারাও ডুবে যেতে থাকল। কতরকমের যে মাছ আর পাখি ওই দ্বীপের চারপাশে ঘুরে বেড়ায়! মাঝে মাঝে তারা পৃথিবীর এক আশ্চর্য সঙ্গীতমালা শুনতে পায় ওই দ্বীপে—তখন তারা কেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে।

হাইতিতি ছুটোছুটি লাগিয়ে দিয়েছে। সে বুঝতে পারছে ম্যাগুেলার কিছু হয়েছে। বুড়ো মানুষটা ঝুঁকে আছে ম্যাগুেলার মুখের কাছে। তারপর সে তিনমুখো লাউ-ক্যাকটাসের হলুদ ফুল নিয়ে এল একটা। ওর ভেতর থাকে ফোঁটা ফোঁটা মধু। বুড়োমানুষটা, আঙুলে ঘি তোলার মতো করে ফুলের ভিতর থেকে সেই মধু তুলে ম্যাগুেলার ঠোঁটে লাগিয়ে দিতেই কেমন চোখ মেলে তাকাল। জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটছে। সে বুঝতে পারছে না এভাবে বালিয়াড়িতে পড়ে আছে কেন। বুড়োমানুষটাকে দেখেই চিনতে পারল। হাইতিতি পাশে গোমড়া মুখ করে বসে আছে।

তার সব মনে পড়ল। কী হতকুৎসিত সব মনস্টার এগিয়ে আসছিল। জীবনেও সে এমন হতকুৎসিত প্রাণী দেখেনি। সে উঠে বসল ঠিক, কিন্তু আবার দেখতে হবে ভেবে সমুদ্রের দিকে তাকাচ্ছে না। সে তো তিমি মাছ দেখেছে। একবার এক কাপ্তানকে বোকা বানিয়ে জাহাজ থেকে নিয়ে এসেছিল এক প্লেট স্যাণ্ডউইচ। প্রথমে ভেবেছিল, মাস্তুলের ডগায় বসে খাবে, পরে মনে হয়েছে, না আর কিছুটা উড়ে যাওয়া যাক। কোনো দ্বীপ-টিপে বসে ব্রেকফাস্ট সারবে। হাইতিতিরও খিদে পেতে পারে। কিন্তু কিছুদূর আসতেই সে দেখেছিল, অতিকায় একটা নীল তিমি

ভেসে রয়েছে। ব্রেকফাস্ট সারার মন্দ জায়গা না। হাইতিতিরও ইচ্ছা একবার ছোট দ্বীপটায় নামে। সে তো বোঝে না, ওটা দ্বীপ না মাছ। বুদ্ধু আর কাকে বলে!

কিন্তু ওগুলো সে কী দেখল! অতিকায় মুখ শুধু। বাবার এনে দেওয়া বইয়ে সে তিমিমাছ দেখেছে। তিমি চিনতে কষ্ট হয় না। হাঙর চিনতে কষ্ট হয় না। বড় বড় স্যালমন মাছ তো ঝাঁকে ঝাঁকে সমুদ্রে ভেসে বেড়াতে দেখেছে। ডলফিনের ঝাঁকে সে একবার নিজেই নেমে গেছিল। হাইতিতিকে নিয়ে সমুদ্রে সাঁতার কেটেছে। ডলফিনদের স্বভাব বড় কোমল। তারা সবাইকে ভালবাসে। বাচ্চা ডলফিনগুলি তাকে দেখে হুটোপুটি লাগিয়ে দিয়েছিল। হাইতিতিকে সুড়সুড়ি দিয়ে এমন হাসিয়েছিল যে, বেচারা ডুবেই মরত।

তবে ওগুলো কী!

বড় বড় পিপের মতো দেখতে। অতিকায় পিপে বলা যায়। দুটো লাল চোখ। জ্বলছে। মাছ এমন হয় না। কোন প্রাণী এমন হয় সে জানে না। তার তো ভয় পাবারই কথা। বাঘ-সিংহকে সে ভয় পায় না। কারণ বইয়ে বাঘ-সিংহের ছবি আছে। প্যান্থার আছে তাদের শহরের ছোট্ট চিড়িয়াখানায়। অজগরও আছে। এমন-কি সে লাউডগা সাপও চিনতে পারে। তাদের মধ্যে নেমেও যেতে পারে সে। গা শিরশির করে ঠিক—তবে তারা তাকে এবং হাইতিতিকে কামড়ায় না। দেখতে না পেলে কামড়াবে কী করে!

চেনা-জানা প্রাণীদের সেজন্য সে ভয় পায় না। কিন্তু ওগুলো কী! কেন ভেসে আসছিল। ওরা কোথায়!

ওমা! অবাক! দেখল, ঠিক আগের নিরিবিলি সমুদ্র। একটা মাছও নেই, পাখিও নেই। আর ছোট খুদে বা অতিকায়, ভিরমি খাবার মুখে তার মনে নেই—যেন অতিকায় এক-একটা ফোটকা মাছ। কিন্তু ফোটকা মাছের তো লেজ থাকে। ওদের যেন তাও ছিল না। তার একটিই ভয়, সে আবার অন্য কোনো জাদুকরের কোলে না উড়ে যায়। কার কত ক্ষমতা সে জানবে কী করে! জীবনে তো সে মাত্র একজন জাদুকরকেই দেখেছে। ওস্তাদ জাদুকর, হেরে জাদুকর, কুটিল জাদুকর, মায়াবী জাদুকর—জাদুকরের সীমা-সংখ্যাও তো কম নেই পৃথিবীতে। বসন্তনিবাসই বলেছিল, এমন এমন সব জাদুকর আছে যারা ইচ্ছে করলে ম্যাণ্ডেলাকে শিল-নোড়া বানিয়ে রাখতে পারে। লঙ্কা বাটতে পারো তার উপর। তখন কেবল চোখের জল ফেলা ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর থাকে না। তবে কি সে আর একটা জাদুকরের দেশে এসে গেছে। মায়াবী সব দৃশ্য চোখে বুঝিয়ে দিচ্ছে—তোমার পালকের টুপি আছে, আমার আছে পাতার পোশাক। দেখো না কী করি। সঙ্গে সঙ্গে ফের মূর্ছা।

বুড়ো মানুষটা এবারে বলল, "এই, তুমি আবার মূর্ছা গেলে কেন। ওঠো।"

"না আমি উঠব না। তুমি মায়াবী জাদুকর।"

"আরে না না, আমি জাদুকর নই। তোমার নাম কী! কীভাবে এলে!"

"হ্যাঁ, কীভাবে এলাম লিখে নাও! আমি বুঝি না, তুমি কী করতে চাও।"

"তুমি তো ছোট্ট খোকি! কী সুন্দর তুমি দেখতে। তোমাকে দেখে আমার আবার কতদিন পর নাচতে ইচ্ছে হয়েছে।"

"আমি নাচব না। বাড়ি যাব। এই হাইতিতি, চল রে। দেখবে কেমন উড়ে যাই," বলেই ম্যাণ্ডেলা পকেট খুঁজতে গিয়ে অবাক, পালকের টুপি নেই, রুপালি ঘণ্টা নেই। ম্যাণ্ডেলা ভ্যাঁক করে কেঁদে ফেলল। ফ্রক ঝেড়েঝুড়ে দেখল, না কোথাও নেই পালকের টুপিটা। রুপালি ঘণ্টাও উধাও।

"আহা কী হয়েছে ! আরে কাঁদছ কেন ? কান্নাকাটি আমার ভাল লাগে না। সংসার জুড়েই তো সবার কান্নাকাটি। একটু হাসো ! হাসো বলছি।"

" তুমি জাদুকর ?"

"ধুস্, আমি জাদুকর হতে যাব কেন ! ট্যা রে রা রা," বলতে বলতে বুড়ো মানুষটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

এমন একটা দৈত্যের মতো মানুষ কেমন শিশুর মতো পড়ে আছে। ধোঁকা দিতে চায় না তো। সে উঠে বসল। হাইতিতি লেজের উপর খাড়া হয়ে বুড়োটাকে দেখছে।

ম্যাণ্ডেলার মাথায় যে কী হল কে জানে ! সে হঠাৎ লোকটার কলার ধরে ঝাঁকাতে থাকল। বলতে থাকল, "তুমি আমার পালকের টুপি চুরি করেছ। দাও বলছি। আমি আর আসব না। কখনও আসব না। দাও।"

"কী দেব ?"

"বারে, জানো না। আমি কিন্তু এবার বসে বসে কেবল কাঁদব।"

"কাঁদবে কেন ?"

"ওটা না পেলে বাড়ি যাব কী করে ! তুমি জানো না বাবাকে খুঁজতে বের হয়েছি। আমার বাবাটা কোথায় যে আছে ! দাও। তুমি যা বলবে তাই করব। দাও। রুপোলি ঘণ্টাটা দাও। হাইতিতি এখানে পড়ে থাকলে তোমার খুব মজা না ! ও হতে দিচ্ছি না। দেবে কি না বলো !"

"আমি বুঝতেই পারছি না, পালকের টুপি, রুপোলি ঘণ্টা—এ সবের মানে কী !" বলেই সে উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটতে থাকল। আর বলতে থাকল, "রাইট লেফট। কুইক মার্চ। অ্যাবাউট টার্ন !"

"ভারী পাজি তো লোকটা। সব নিয়ে পালাচ্ছে।" ছুটতে গিয়ে একটা ক্যাকটাসে ম্যাণ্ডেলার ফ্রক আটকে গেল।

"এই হাইতিতি, ছুটে যা। বুড়োটা পালাচ্ছে। শিগ্‌গির যা।"

হাইতিতি লম্বা লেজের উপর ভর করে ধাঁ করে একটা দৌড় মারল। বুড়ো মানুষটির পেছন থেকে পাতার পোশাক কামড়ে ধরল। খাবলা মেরে কিছুটা ছিঁড়েও ফেলল।

"আরে জ্বালা হল দেখছি !" বুড়োমানুষটা পেছন ফিরে তাকাল ! তারপর ম্যাণ্ডেলা কাছে এলে বলল, "এটা ঠিক হল ? কত কষ্ট করে একখানা পোশাক বানিয়েছি। ওটা তোমার হাইতিতিটা দিলে ছিঁড়ে। শীতে আমি কষ্ট পাব না। তোমার কোনো মায়া-দয়া নেই। তোমরা এলে কী করে দ্বীপটায় বললে না তো। চর নও তো। আমাকে ধরিয়ে দেবার ফাঁদ পাতছ।"

"আমরা তোমাকে ধরিয়ে দেব কেন !"

"কী জানি। আমাকে খুঁজছে। আমাকে তোমরা আর যাই করো ধরিয়ে দিও না। লক্ষ্মী মেয়ে। যা বলবে করব।"

"তাহলে দাও ফিরিয়ে সব।"

"আমি কিছু নিইনি। সত্যি বলছি। তিন সত্যি। যিশুর দিব্যি।"

"ও বুঝি না ! তোমাকে দিতে হবে। তুমি মায়াবী জাদুকর। কোত্থেকে ওরা ভেসে এল বলো ?"

"কারা ?"

"ঐ যে পিপের মতো ভেসে-ভেসে ঝাঁকে-ঝাঁকে আসছিল।"

এতক্ষণে বুড়োমানুষটা মনে করতে পারল, তার বাজনা শুনে আবার তারা চঞ্চল হয়ে উঠেছিল।

সে এবার বসে পড়ল একটা মসৃণ পাথরের উপর। বলল, "ওগুলো সানফিশ। তা নীল রঙের। বিশ্রী দেখতে। তুমি ছোট খোকি ভয় পাবার কথা।"

"এত বড়-বড় পিপে।"

"তা দু-টনের মতো ওজন হয়। বড় তো হবেই।"

"সত্যি বলছ ?"

"আমি মিছে কথা কেন বলব ! কার সঙ্গে বলব। তোমরা কী করে এলে। পাখির বাসাগুলি ভুতুড়ে হয়ে যায় কী করে ! ওরা ভেসে থাকে কী করে !"

ম্যাণ্ডেলার দুষ্টুমির আগ্রহ বেড়ে গেল। সে ছোট হলেও সব বোঝে। লোকটার মধ্যে একটা ভুতুড়ে ভয় কাজ করছে। এই ভয়টা দেখিয়েই কাজ হাসিল করতে হবে।"

সে বলল, "ওগুলো ফিরিয়ে না দিলে আবার দেখবে পাখির বাসা বাতাসে ভেসে ভেসে তোমার কাছে চলে আসবে। শিগ্‌গির দাও।"

এটা শুনেই বুড়ো লোকটা দৌড় লাগাল।

ম্যাণ্ডেলা বলল, "আরে না না। তুমি যেও না।" হাইতিতিও মজা পেয়ে গেছে। সে ছুটছে, বুড়োমানুষটাকে ধরবে বলে।

ম্যাণ্ডেলা ডাকছে, "ওরা আর আসবে না। তুমি যেও না। আমার পালকের টুপি নিয়ে গেলে আমি আর বাড়ি ফিরে যেতে পারব না। মা আমার জন্য কান্নাকাটি করবে।"

'মা' কথাটি শুনেই লোকটা আর দৌড়ল না। কেমন ধীরে-ধীরে হাঁটু গেড়ে পাথরের উপর বসে পড়ল।

ম্যাণ্ডেলা কাছে গিয়ে দেখল বুড়োমানুষটার চোখ থেকে জল টপ্ টপ্ করে পড়ছে। আর বিন্দু-বিন্দু হয়ে পাথরে মুক্তো হয়ে যাচ্ছে।

সে বুড়োমানুষটার হাঁটুর কাছে উবু হয়ে বসল।

"তুমি কাঁদছ ?"

বুড়োমানুষটার সাদা দাড়ি নড়ে উঠল। সাদা ভ্রূ কাঁপতে থাকল।

"তুমি কাঁদছ কেন !"

বুড়ো লোকটা জামার আস্তিনে চোখের জল মুছে বলল, "কারা তোমাদের পাঠিয়েছে ! বলো কারা ? সত্যি করে বলো। মানুষ দেখলে ভয় পাই। কিন্তু তোমার মতো ছোট্ট খোকি দেখে আবার কেমন চঞ্চল হয়ে উঠেছিলাম। তোমার মা আছে না ?"

"হ্যাঁ মা আছে। মামা আছে। মামাটা বিশ্বাসই করে না, পৃথিবীতে জাদুকর থাকে। জাদুকর ইচ্ছে করলে শিল-নোড়া বানিয়ে রাখতে পারে। তুমি সত্যি করে বলো, জাদুকর নও তো !"

"আমি জাদুকর হলে সব যুদ্ধবাজদের মাথা ঠুকে দিতাম জানো !"

যুদ্ধবাজ কথাটা ম্যাণ্ডেলা নতুন শুনল।

"ওরা কী করে ?"

"মানুষ মারে।"

"বাঘ ওরা ?"

"আরে না। বাঘ হবে কেন। ওর তো মায়া-দয়া আছে। খিদে না পেলে খায় না। যুদ্ধবাজরা কেবল ছুরিতে শান দেয়। লোকের মুণ্ডু কেটে নেয়।"

ম্যাণ্ডেলার খুব রাগ হল যুদ্ধবাজদের উপর। সে বলল, "ওরা তোমার কী করেছে ! আমি ওদের মাথার টুপি খুলে নেব। টুপি খুলে নিলে মানুষের ন্যাড়া মাথা।"

বুড়ো লোকটি এবার কোনো কথা না বলে উঠে দাঁড়াল। বলল, "তোমাদের কে পাঠিয়েছে বলো ?"

"কেউ না। বলছি না বাবাকে খুঁজতে এসেছি। আমার বাবা জাহাজডুবিতে নিখোঁজ। মানুষের বাবা না থাকলে কী কষ্ট বলো।"

আবার বুড়ো মানুষটা ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকল।

ম্যাণ্ডেলা বলল, "তুমি খোকি আছ ! প্যানপ্যানে কান্না। যা বলছি বলো। কোথায় রেখেছ পালকের টুপি ?"

মহা বিড়ম্বনা। কিছু বলছে না। এবারে চোখের ফোঁটা আরও বড় হয়ে পড়তে

থাকল। আর পাথরে পড়েই মুক্তা হয়ে ছড়িয়ে যেতে থাকল। এর মধ্যে দুটি বড় সুন্দর পাথর ম্যাণ্ডেলা দেখতে পেয়ে জেবে পুরে ফেলার সময় বলল, "ও দুটো নিলাম। রাগ করছ না তো?"

"না না। যুদ্ধবাজদের ছাড়া আমি কাউকে ঘৃণা করি না। আচ্ছা খোকি, তুমি সত্যি খোকি আছ!"

"আমি খোকি হতে যাব কেন। আমি ম্যাণ্ডেলা।"

"ম্যাণ্ডেলা, যুদ্ধ কবে শেষ হবে জানো!"

যুদ্ধ শেষ হবে কবে ম্যাণ্ডেলা বুঝতেই পারেনি। হ্যাঁ, এই ক'দিন আগে বুচারমামা বলছিল, একটা যুদ্ধ কোথায় হয়ে শেষ হয়ে গেছে। লোকটা যুদ্ধ-যুদ্ধ করছে কেন বুঝতে পারছে না।

আর ম্যাণ্ডেলা দেখেছে, ওদের গির্জার কাছে শান্তির মিছিল। সেটা তো যুদ্ধের জন্য নয়। কী এক মারাত্মক জিনিস মানুষের হাতে চলে এসেছে—তাতে করে নাকি, তাদের সুন্দর শহরটাকে নিমেষে ভস্ম করে দিতে পারে। মানুষ এত নিষ্ঠুর হয় কী করে। বড়-বড় পোস্টারে সে দেখেছে শিশুদের ছবি। ঠিক তার মতো ছোট্ট বালিকার দু' হাতে দুটো পুতুল। দুই দেশের যুদ্ধবাজ নেতার মুখ পুতুলে আঁকা। শিশুটি তাদের মাথা ঠুকে দিচ্ছে। বলছে নটি বয়, আর দুষ্টুমি করবে! ম্যাণ্ডেলা তার যতটুকু জানা আছে, লোকটাকে আশ্বস্ত করার জন্য সব বলল।

তারপর বলল, "এবারে দাও পালকের টুপিটা!"

"আমি নিইনি। সত্যি বলছি। আমরা যখন নাচছিলাম, তখন কোথাও পড়ে যায়নি তো!"

"তাহলে কী হবে?"

"কেন, আমরা খুঁজব।"

"এত বড় দ্বীপটার কোথায় কখন নেচেছি, কোথায় পড়ে গেল!" ম্যাণ্ডেলার আবার কান্না-কান্না মুখ।

বুড়োলোকটা বলল, "কাঁদছ কেন? দ্বীপটায় তোমাকে আমি নিয়ে যাব। তুমি ওখানে থাকবে। হাইতিতি থাকবে। বয়স হয়ে গেছে—কবে মরে যাব ঠিক নেই। দ্বীপটায় সব আছে। তোমাকে আমি সব চিনিয়ে দেব। মুখ গোমড়া করে রাখলে আমার ভাল লাগে না।"

আসলে বুড়োলোকটা এই চায়। ভেতরে ভেতরে ষড়যন্ত্র আঁটছে। ম্যাণ্ডেলা বলল, "আমি যাব না। মার কাছে যাব।" তারপর ফ্যাকফ্যাক করে কান্না! "কান মলছি, যদি আর আসি। হাইতিতিটা বুঝতেও পারছে না, দ্বীপটায় তারা আটকা পড়ে গেছে।" সে নিজেই এবার খুঁজতে থাকল, "কোথায় পড়ল তবে!"

বুড়োলোকটা বলল, "পালকের টুপিটা এত তোমার দরকার।"

"বা রে, ওটা না থাকলে আমি যাব কী করে! ওটা পরলে উড়ে যেতে পারি! যেখানে খুশি যেতে পারি।"

"আমারও যে চাই একখানা পালকের টুপি।"

"তুমি কী করবে ও দিয়ে। ও তো ছোটরা পায়। বড়দের দেওয়া হয় না।"

"কেন দেওয়া হয় না! কী দোষ!"

"আরে বাবা দোষের কথা বলছি না। দোষ কেন হবে। বড়রা যাবে কোথায়। ওদের শেকড়-বাকড় আটকে থাকে না মাটিতে।"

ম্যাণ্ডেলার নিষ্পাপ মুখ, সরল বিশ্বাস দেখে কেমন মুহ্যমান হয়ে গেল মানুষটা। তারপর মনে হল হতেই পারে। না হলে গভীর সমুদ্রে সে যখন জাহাজ থেকে ঝাঁপ দিল তখন তো তার মরে যাবার কথা। সে এল কী করে দ্বীপটায়! পায়ের জখমই বা সেরে গেল কীভাবে। তার তো মনে আছে, সে উঠে দেখেছিল, একটি নির্জন দ্বীপের বালিয়াড়িতে পড়ে আছে। সমুদ্রে থাকে

কত হিংস্র হাঙর। কেউ তাকে ছুঁয়েও দেখেনি। কেবল দেখেছিল, দূরে একঝাঁক ডলফিন। তারাই কি পাহারা দিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে এসেছিল। এই থেকে এক মায়া প্রাণীজগতের প্রতি। সে তখন একটা চিংড়িমাছও পুড়িয়ে খায় না। প্রথম প্রথম খেতে হত—পরে সে পাখির বাসা খোঁজ পেয়ে একদিনও খায়নি। বাসাগুলি তৈরি পাখির মুখের লালা থেকে। জলে ভিজিয়ে রাখলে সুন্দর স্যুপ হয়। কচ্ছপের খোলের এক খোল হলে তার দু-তিন দিন চলে যায়। সে দ্বীপটায় হাজির হয়ে প্রথমে ভেঙে পড়লেও পরে মনে পড়ে গেছে সব তার। দ্বীপটা তাকে এক মায়ার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। এর ঘাসের উপত্যকা, ছোট্ট অরণ্য, অসংখ্য পাখি, লাল নীল ক্যাকটাস যেন পৃথিবীর সুদূরতম একটা গ্রহাণু। সে প্রায় রাজার মতো এখানে ঘুরে বেড়াতে পারে। কেউ শাস্তি দেয় না। কম্বল প্যারেড করায় না। অলৌকিক কোনো মহিমা না থাকলে এমন একটা দ্বীপে সে আসে কী করে! ম্যাণ্ডেলারও থাকতে পারে—নিষ্পাপ সরল মেয়েটির কাছে এমন কিছু থাকাই স্বাভাবিক।

সে বলল, "ওদিকে না ম্যাণ্ডেলা। এখন খুঁজে লাভ নেই। চলো বরং আমরা আগে স্নান-টান সেরে কিছু খেয়ে নি।

"কী খাব!"

"ঘাসের বীজ থেকে মণ্ড হয়। হলুদ ক্যাকটাসের ফুলে মধু হয়। পিঠে বানিয়ে দিতে পারি।"

"ভগবানের দিব্যি করে বলো তুমি আমাকে শিল-নোড়া বানিয়ে রাখবে না।"

"আমি জানিই না ওসব। ভগবানের দিব্যি। হল তো। এসো। আমারও খুব খিদে পেয়েছে। তোমাকে পেয়ে কী নাচটাই নাচলুম! খিদের দোষ কী!"

বুড়োমানুষটা কী ভাবে, ম্যাণ্ডেলা ঠিক টের পায়। বুড়োমানুষটা যদি ষড়যন্ত্র করত তবে সে ধরতে পারত। একবারও তেমন কিছু মনে হয়নি। কোনো দুষ্টুবুদ্ধি নেই। বুড়ো মানুষটা বড় তাড়াতাড়ি হাঁটে। ওর সঙ্গে ম্যাণ্ডেলা হাঁটতে গিয়ে বার বার পিছিয়ে পড়ছে। সে দৌড়ে নাগাল পায়। মাঝে মাঝে সে রেগে যায়। বুচারমামার সঙ্গে হাঁটতে গিয়েও দেখেছে, কিছুতেই নাগাল পায় না। দৌড়ে ধরে ফেলতে হয়। জাদুকর বসন্তনিবাসের ছিল একই ধরনের হাঁটা। ভাল মানুষরা এ-ভাবেই হাঁটে। কূটবুদ্ধি থাকলে হাঁটায় গোলমাল থাকত। সে দৌড়ে গিয়ে বুড়োমানুষটার হাত ধরে বলল, "আর কদ্দুর।"

"এই তো, দেখছ না। সামনে পেল্লাই গাছটা। তার নীচে আমি থাকি।"

"তাই তো! কী বড় গাছ!"

সে বলল, "ওটা কী গাছ!"

"বাওবাব গাছ।"

"আমাদের বাড়িতে জানো, কৌরি পাইনের গাছ আছে। তার নীচে আমাদের নীল রঙের কাঠের পাটাতনের বাড়ি। দূর থেকে মনে হবে মিকিমাউসের মতো। সবুজ লন সামনে। বেতের চেয়ার সাজানো। আমাদের উপত্যকা থেকে সমুদ্র কী কাছে! রাত-দিন ঝোড়ো হাওয়া। আর শোঁ-শোঁ গর্জন। ঝোড়ো হাওয়ায় মামার চুল এলোমেলো হয়ে যায়।

সহসা বুড়োমানুষটা বলল, "হাইতিতি কোথায়!"

"তাই তো! গেল কোথায়!"

এই রে, ও এবার দ্বীপটায় না হারিয়ে যায়।"

"এত বড়।"

"হ্যাঁ। এখানে বালিয়াড়ি আছে, পাহাড় আছে। অরণ্য আছে। সবুজ ঘাসের উপত্যকা আছে। মৌটুসিলতার ঝোপ আছে। হারিয়ে যেতেই পারে।"

ম্যাণ্ডেলা চিৎকার করে ডাকল,

"হাইতিতি, তুমি কোথায় ?"

তখনই দেখতে পেল দূরে একটা বড় পাথরের আড়ালে মুখ তুলে দাঁড়িয়ে আছে। আসছে না।

"ওখানে ওটা কী করছে ?"

"কী জানি !" ম্যাগুেলা আবার হাঁকল, "এখন আমাদের দুষ্টুমি করায় সময় নয়। এখন আমরা খাব। এসো শিগ্‌গির বলছি। তোমাকে নিয়ে আমার শতেক জ্বালা। এসো বলছি। না এলে তোমাকে ফেলে আমরা চলে যাব।"

তাতেই কাজ। হাইতিতি লেজের উপর লাফাতে লাফাতে চলে আসছে। হাতে ওর ওটা কী। বেশ বড়সড়। কোনো ডলফিনের বাচ্চা বগলে করে চলে আসেনি তো ! ওর ঐ স্বভাব। ছোট কাউকে দেখলেই তার সঙ্গে ভাব জমাতে চাইবে। সে কুকুরের ছানা হোক কিংবা বিড়ালছানা হোক তাতে তার আসে যায় না। বুদ্ধুটা বোঝে না ওর কাছে যেটা খেলা, ছানাবেড়াল কিংবা ডলফিনের কাছে সেটা মৃত্যুর শামিল। এ-জন্যই একবার ডলফিনের বাবা-মা'রা তাকে সুড়সুড়ি দিয়ে ডুবিয়ে মারতে চেয়েছিল। কত অনুনয়-বিনয় করে তাকে সেবারে বাঁচিয়েছে। বলেছে, তোমরা আমাদের বন্ধু। বন্ধুকে কখনও মারতে হয় না। হাইতিতিটা বোকা আছে। ভারী বোকা। ও তো বোঝে না অত ভাব করতে গেলে তোমাদের ছানাপোনাদের প্রাণান্ত।

হাইতিতি কাছে এলে দেখল বগলে সেই একটা আনারস ক্যাকটাস। ঠিক বুঝেছে, খাবার জন্য ম্যাগুেলাদি বুড়োমানুষটার সঙ্গে যাচ্ছে। বুড়োমানুষটার দিকে তাকিয়ে বলল, "ওর জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি বুড়োমানুষ, ভাগেরটা খাব। হাইতিতি সব বোঝে। আমার সঙ্গে ওর লাঞ্চ না হলে, সারাদিন মনমরা হয়ে থাকে।"

গাছের কাছে যেতেই দেখল, কী পেল্লাই একখানা কাণ্ড গাছের। বাকল নেই। হাতির দাঁতের মতো সাদা রঙ কাণ্ডের। একটা বড় ডাল নীচে নেমে এসেছে। কোনো ঘরবাড়ির চিহ্ন নেই। এক-একটা ডাল চ্যাপ্টা তক্তার মতো। যেন এক-একখান চৌকি পাতা আছে। বুড়োমানুষটা ততক্ষণে লাফিয়ে মাটির সঙ্গে মিশে-যাওয়া ডালটায় উঠে হাত বাড়িয়ে দিল।

"ও মা, গাছে উঠছ কেন !"

"এসো না। এটাই আমার ঘরবাড়ি।"

"বা রে, মানুষের ঘরবাড়ি গাছের মাথায় হয়।"

"হয় তো।"

লোকটা হাত বাড়িয়ে আছে। আর ম্যাগুেলা গাছটা ছাড়া এখন চারপাশে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। হাত-পা মেলে যেন গাছের ডালপালা তাকে জড়িয়ে ধরেছে। সে ভয় পেয়ে গিয়ে বলল, "আমি কিন্তু আবার পাখির বাসা বাতাসে ছেড়ে দেব। বুঝবে মজা !"

"আরে তুমি কী ! তুমি আমার ছোট্ট খোকি। গাছের পাতাগুলি দেখছ না। কী সবুজ গন্ধ ! এমন সুন্দর খোকিকে কে না ভালবাসে। গাছটিও তোমাকে ভালবাসে। গাছের পাতাগুলি নাচছে। ডালপালা নাচছে। উঠে এসো, ভয় নেই।"

আর আশ্চর্য ! গাছটার মাথায় ম্যাগুেলা কত সহজে উঠে যেতে পারল। পালকের টুপির দরকার হয় না। লরেল গাছের পাতার ছাউনি-ঘরে। ডালপালার মধ্যে একটা মানুষ তার বাসা বানিয়েছে। এক-একটা ডাল যেন তার টুল-টেবিল, খাবার টেবিলের মতো দাঁড়িয়ে আছে। ভাঁড়ার ঘর, বসার ঘর, শোবার ঘর। সুন্দর, ছিমছাম। দারুচিনি-এলাচের গন্ধ।

"আমার বড় খিদে পেয়েছে বুড়োমানুষ।

তাড়াতাড়ি করো।"

"বা রে, চানটান করবে না। হাত-মুখ ধোবে না।"

"চানটান আমাদের হয়ে গেছে। ওটা সকালেই সেরে নিই।"

"কোথায় চান করলে।"

"কেন সমুদ্রে।"

"আরে নুনে কড়কড় করবে না শরীর। মিষ্টি জলে চান করে নাও।"

"আমার একটাই ফ্রক। আর ভেজাব না।"

"কেউ দেখবে না। এই নাও পাতার পোশাক।"

"বা রে, এটা আমার লাগবে কেন?"

"লাগবে। গায়ে দিয়ে দেখো না।"

ম্যাগুেলা গায়ে দিয়ে দেখল, সত্যি তার মাপের। বলল, "এটা কার জন্য করেছ। তোমার তো কেউ নেই।"

বুড়োমানুষটা মাথা ঝাঁকাল। বলল, "আছে আছে।"

"সে কোথায়?"

"কেন এখানে।"

"মারব তোমাকে। তুমি আমাকে আটকে রাখতে চাও। ওটা পরব না।"

"সোনা মেয়ে আমার। কতদিন থেকে বানিয়েছি। কত কষ্ট করে জারুল পাতা সংগ্রহ করতে হয়। এই দুটোই পোশাক আমার। একটা আমার আর একটা···।" বলে থেমে গেল।

"আর একটা কার, বলো বলো।" ম্যাগুেলা বুড়োমানুষটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। "আমি চান করব না। পাতার গাউন পরব না। পরব না, পরব না।"

"সোনা আমার—আমি দেখব কেমন লাগে তোমায়। আমার তো কেউ নেই। তুমি না এলে সত্যি আমার কেউ আছে আর মনে থাকত না। বুড়ো হয়ে গেলে মানুষ সব ভুলে যেতে থাকে। সব কিছুই কেমন গতজন্মে ঘটে গেছে মনে হয়।" বুড়োর চোখ ছলছল করছে। ম্যাগুেলারও স্বভাব তেমনি। কারো মনে একদম দুঃখ দিতে পারে না। বলল, "তিন সত্যি করে বলো, আমাকে পাতার গাউন পরিয়ে দ্বীপটায় আটকে রাখবে না।"

"না, না, না।" তিন সত্যি করলাম।

"বেশ চলো, কোথায় চান করব।"

বুড়োমানুষটা তরতর করে নেমে যেতে থাকল গাছ থেকে। নেমে যেতে কষ্ট হচ্ছে না। যেন একটা দিকের ডাল সিঁড়ির মতো নীচে নেমে গেছে। পাহাড়ের ওপাশে এক সুন্দর সরোবর। রাজহাঁস, জলপিপি, ডাহুক চরে বেড়াচ্ছে। বুড়োমানুষটাকে দেখে ওদের কী আনন্দ! ম্যাগুেলা আর বুড়োমানুষটি জলে ডুব দিলে, ওরাও ডুব দিল। বুড়োমানুষটা ম্যাগুেলা জলে ভেসে উঠলে ওরাও জলে ভেসে উঠছে।

বুড়োমানুষটা উঠে গা মোছার সময় বলল, "আমার ছোট্ট অতিথি। তোরা ভাবিস, আমার আর কেউ নেই। এই দেখ ম্যাগুেলা। সে তোদের মতো উড়তে পারে। মনে করিস তোরাই দেখতে সুন্দর—আমরা কত সুন্দর দেখ। ম্যাগুেলাকে দেখলে বুঝবি মানুষ কত সুন্দর হয়।"

ম্যাগুেলা বুড়োমানুষটার গায়ে থাপ্পড় মেরে বলল, "যাঃ আমার লজ্জা লাগছে। তুমি যে কী না! আমি খুব সুন্দর কে বললে!"

"বা রে, তুমি তো ছোট্ট পরি। তোমার দুটো পাখা আছে।"

"মিছে কথা। পাখা নেই।"

"তুমি দেখতে পাও না। আমি পাই। তোমার সুন্দর দুটো ডানা। প্রজাপতির মতো তিরতির করে কেবল কাঁপে। তুমি দেখতে পাও না। আমি পাই।" পাশেই হাইতিতি দাঁড়িয়ে। বগলে তার

আশাপূর্ণা দেবী

এবং

অসাধারণ দুটি উপন্যাস

আশাপূর্ণা দেবী 'রাজকুমারের পোশাকে' উপন্যাসে প্রায় একালের এক আরব্য-উপন্যাসের গল্প শুনিয়েছেন। তেমনই ঝলমলে এবং বর্ণময়। অথচ যাকে নিয়ে এই গল্প, সে নিতান্তই এক মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। হঠাৎই সেই ছেলেটি কী করে হিঙুলগঞ্জের 'ছোট রাজাবাবু' হয়ে উঠল, কীভাবেই বা ফের বদলে গেল তার জীবন—তাই নিয়েই এই আকর্ষণীয় উপন্যাস। আরেকটি উপন্যাস 'গজ উকিলের হত্যা-রহস্য।' রহস্য, তবু দারুণ মজাদার সেই রহস্য। এই উপন্যাস একাধারে রসঘন ও রহস্যঘন, কৌতূহলকর ও কৌতুকমুখর, উত্তেজনায় ভরা ও উল্লাসে ঠাসা।

আশাপূর্ণা দেবীর বই

রাজকুমারের পোশাকে ৫·০০

গজউকিলের হত্যা-রহস্য ৮·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯ ফোন ৩৪৪৩৬২

আনারস-ক্যাকটাস। একবার খেয়ে স্বাদ পেয়ে গেছে। পাছে কেউ নিয়ে যায়, সেজন্য ওটা বগল থেকে নামাচ্ছে না। এমন-কি ম্যাণ্ডেলা তাকে অনেক বলেকয়েও চান করাতে পারেনি। সে পাড়ে দাঁড়িয়ে ওদের চান করা দেখছিল। বুড়োমানুষটা হাইতিতির দিকে তাকিয়ে বলল, "কী রে, তোর দিদির দুটো প্রজাপতি-পাখা আছে না। ও না থাকলে কেউ উড়তে পারে। কী বলিস ?"

হাইতিতি লাফাল লেজে ভর করে। মাথা ঝাঁকাল। সায় দিচ্ছে বুড়োর কথায়।

বুড়োমানুষটা বলল, "এবারে পাতার পোশাক পরে নাও।"

ভয় লাগছিল। কী জানি কী হবে ! কিন্তু বুড়োমানুষটার চোখে অসীম আগ্রহ তাকে পাতার পোশাকে দেখার। যেন কত দীর্ঘকাল ধরে এই একটা প্রতীক্ষায় দ্বীপটায় সে এখনও বেঁচে আছে। তা না হলে সে কবেই মরে যেতে পারত। ম্যাণ্ডেলা পাতার পোশাকটা এক নিশ্বাসে পরে ফেলল। তারপর মনে করার চেষ্টা করল, সে আগের ম্যাণ্ডেলাই আছে কি না। হাইতিতিকে সে দেখতে পাচ্ছে। রাজহাঁসগুলো ভেসে যাচ্ছে জলে। জলপিপি ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছে। তার খিদেটাও একই রকমের আছে। না, পাতার পোশাক পরে সে ছাগল-ভেড়া বনে যাচ্ছে না। কিংবা নুড়ি পাথর। কিংবা শিল-নোড়া। সে আগের ম্যাণ্ডেলাই আছে। পাতার পোশাকে তাকে ছোট বনদেবীর মতো দেখতে লাগছে।

ম্যাণ্ডেলা বুড়োমানুষটাকে আবার জড়িয়ে ধরল। বলল, "তুমি আমার ফ্রেণ্ড।"

বুড়োমানুষটা বলল, "তুমিও আমার।"

বড় বন্ধুত্ব হয়ে গেল দু'জনের মধ্যে।

হাইতিতি সব বোঝে। ওর দিকে কেউ তাকাচ্ছে না দেখে সে আনারস-ক্যাকটাসের উপর মুখ ভার করে বসে আছে।

সহসা বুড়োমানুষটা হা-হা করে হেসে উঠল। হাইতিতির হাত ধরে টেনে তুলে বলল, "ইউ আর অলসো মাই ফ্রেণ্ড।"

আর সঙ্গে সঙ্গে পায় কে। সে একাই ভিজে জামা-কাপড় আনারস-ক্যাকটাস হাতে নিয়ে হাঁটা দিল ওদের সঙ্গে। এখন লাঞ্চের সময়। তার কিছুটা রাক্ষুসে স্বভাব আছে বলে দিদি নিন্দামন্দ করে। তা করুক। খাবার সময় মুখচোরা স্বভাব হলে নিজেরই দুর্ভোগ। অন্য সময় লাজ-লজ্জা থাকলেও খাবার সময় সে খুব মিশুকে। আনন্দে দিশেহারা হয়ে সে তার দিদির পিঠে মুখ দিয়ে ছোট্ট একটা ঢুঁ মেরে দিল।

॥ সাত ॥

বুচার সেবারে ভারী বিরক্ত হয়েছিলেন বোনের উপর। ম্যাণ্ডেলা ফিরে আসায় মনে হয়েছে লুসির আর কোথাও যাবে না মেয়েটা। কিন্তু বুঝছে না কেন যে, মেয়ে বাড়ি থেকে দু-দিন নিখোঁজ হয়ে থাকতে পারে, তার যে আবার নিখোঁজ হবার সম্ভাবনা। বাইরে বের হবার স্বাদ পেলে কে সেটা সহজে ছাড়তে চায় ! লুসি কিছুতেই তা বোঝে না। তিনি দেখে খেপে গিয়েছিলেন, টেবিলে গরম কফি তার জন্য রাখা হয়েছে। সংসারে এত বড় দুর্যোগের মুখে যদি ওর এতটুকু হুঁশ থাকে। ওঠার সময় বলেছিলেন, বিকেলে ফের আসছি। তোমার মেয়ের ব্যাপার-স্যাপার আমার ভাল লাগছে না। একজন ভারততত্ত্ববিদ আসবেন। আর আসবেন হাসিমারা। হাসিমারা পুলিশের মনস্তত্ত্ব বিভাগের লোক। পুলিশ জানিয়েছে, এটা তাদের কাজ নয়। হাসিমারা যদি কিছু করতে পারে।

আর বিকেলেই হাজির হয়েছিল বুচার

হাসিমারাকে নিয়ে।

লুসি দেখে তো হেসে কুটিকুটি। সে আড়ালে হাসছিল। দাদার সামনে হাসলে ধমক খেতে হত। হাসিমারার পেট-পিঠ গাল-গলা সব সমান। গলাটা নেই বললেই হয়। কাঁধের সঙ্গে মাথাটা লেগে আছে। আর পোশাক পরেছে কোট এবং জ্যাকেটসহ। মানুষটা হাঁটলে পেটটা তার ফুট-দুই আগে হাঁটে। সে সবুজ লন দিয়ে উঠে আসতেই লুসি ঘর থেকে দৌড়ে বের হয়ে গেছিল। ম্যাণ্ডেলা ঘরে।

বুচার এবং আরও গণ্যমান্য মানুষ এসেই বিষয়টা নিয়ে মেতে উঠল।

হাসিমারা তখন পিঁ-পিঁ করে ডেকেছিল, কই সেই মেয়েটা। বুচারকে বলেছিল, বলবেন না আমি পুলিশের লোক। ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব করা দরকার। রাস্তায় আজকাল খারাপ মানুষের প্রাদুর্ভাব বেড়েছে। হামেশাই বাচ্চা চুরি হয়ে যাচ্ছে। আপনার ভাগ্নিও মনে হয় কোনো খারাপ মানুষের পাল্লায় পড়েছে। আপাতত কাজ হাসিল করার জন্য তাকে নিয়ে লুকিয়ে রাখতে পারে কেউ।

ম্যাণ্ডেলা হাসিমারার কাছে আসতেই অবাক হয়ে বলেছিল—"ও-মা এ তো একটি শিলমাছ। ছুঁচলো গোঁফ কেন তোমার!"

হাসিমারা রাগ করেননি। তিনি জানেন শিশুরা নিষ্পাপ হয়। ম্যাণ্ডেলার মগজের মধ্যে ঠিক শিলমাছ খেলা করে বেড়াচ্ছে। হাসিমারা একজন উৎকৃষ্ট মনস্তত্ত্ববিদের মতোই বললেন, "তুমি বুঝি শিলমাছ পছন্দ করো? তোমাকে একটা শিলমাছের বাচ্চা এনে দেব। কিন্তু সেটা রাখবে কোথায়?"

"কেন বরফের দেশে!"

"সে তো অনেক দূর।"

"আমি ইচ্ছে করলেই সেখানে যেতে পারি।"

"তা তুমি পারো। তুমি পারো না বলিনি তো! কিন্তু কথা হচ্ছে যাবে কী করে! একটা বোট ভাড়া করলে কেমন হয়।"

"বোট!"

"বোট পছন্দ না হলে জাহাজ।"

"না, আমার জাহাজ ভাল লাগে না। আমার কেবল উড়তে ভাল লাগে। তুমি শিলমাছ, বলে যাও না মাকে, মা যেন আমি উড়ে গেলে চিন্তা না করে।"

হাসিমারাকে শিলমাছ বলাতে খেপে গেছিলেন বুচার। "কী সব অসভ্যতা হচ্ছে!"

হাসিমারা হাত তুলে বলেছিলেন, "আহা, আপনি আবার এতে নাক গলাচ্ছেন কেন। আপনাদের দোষেই শিশুরা নষ্ট হয়ে যায়। এদের শিক্ষার আগে আপনাদের শিশু মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে শিক্ষা দরকার।" ধমক খেয়ে বুচার মুখ শক্ত করে বসে গেছিলেন।

"কোথায় যাও?"

শিলমাছের গোঁফ নড়ছে প্রশ্ন করতে গিয়ে।

"ও শিলমাছ, তোমার গোঁফ কাঁপে কেন!"

হাসিমারা নিজেও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। মেয়ে তো নয় বিচ্ছু। হাসিমারা নার্ভাস হয়ে গিয়ে একটা পা আর একটা পায়ের উপর তুলে আসছেন। এত ভারী পা যে সেটি দু-হাতে এনে হাঁটুর উপর রাখতে হচ্ছে। ধরে না রাখলে ফের হড়কে যাচ্ছে। ম্যাণ্ডেলা ফিক করে হেসে দিল।

বুচার জোর ধমক লাগালেন, "আঃ ম্যাণ্ডেলা, এখন হাসবার সময় নয়। তিনি যা বলছেন ঠিক-ঠিক জবাব দাও।"

হাসিমারা কান চুলকাতে থাকলেন তখন। কান চুলকানো শেষ হলে বলেছিলেন, "ধমকাবেন না। একবারই বলেছি। শিশুদের ধমকাতে নেই।" ম্যাণ্ডেলার দিকে হাত বাড়িয়ে বলেছিলেন, "কাছে এসো না। কাছে এসো। ভয় কী! আমি তোমার মামার মতো আর একটা

মামা হই। আমাকে বলো, কে তোমাকে নিয়ে গেছিল !"

ম্যাণ্ডেলা খুব অবাক হয়ে বলেছিল, "কে নেবে ? আচ্ছা শিলমাছ, কেউ যদি বাতাসে ভেসে যায়, তবে কি সেটা খুব খারাপ কাজ।"

হাসিমারা জোর প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেছিলেন, "নিশ্চয় নয়। নিশ্চয় নয়। উড়ে-যাওয়া খারাপ কাজ নয়। তবে যেখানেই যাবে, মাকে বলে যাবে। বলো তো আমি তোমার সঙ্গে যাব, তোমার মামা যাবেন। কে না বাতাসে ভেসে পৃথিবী ঘুরতে ভালবাসে ? কী বলেন ডাঃ বুচার।"

"অত্যন্ত সঙ্গত কথা।" বুচার থুতনি লাঠির উপর রেখে ঘোলা-ঘোলা চোখে তার পর বলেছিলেন, "হাসিমারা, কী তাজ্জব কাণ্ড, সকালে দেখি আমার টুপি বাতাসে ভেসে চলে যাচ্ছে।"

হাসিমারা জানালেন, "জলবায়ু আর আগের মতো নয়। ওয়েদার খুব চেঞ্জ করছে। পরমাণু বিস্ফোরণের প্রতিক্রিয়া সব। তেজস্ক্রিয়া—বোঝলেন না। আপনার ভাগ্নির মধ্যেও সেটা সংক্রামিত হতে পারে। এক অদ্ভুত চিজ মানুষ আবিষ্কার করেছে। পালকে কিংবা লেজে লাগিয়ে নিলেই মঙ্গলগ্রহে চলে যাওয়া যায়।"

বুচার কথাটা শুনেই বিষম খেয়েছিলেন প্রচণ্ড। প্রচণ্ড কাসি। কোনোরকমে কাসি থামিয়ে বলেছিলেন, "টুপির তো আর লেজ গজায়নি।"

"গজাতে কতক্ষণ। ওটাকে যদি খুঁজে বের করে আনতে পারেন, আর যদি ফিরে পেয়ে থাকেন। ল্যাবরেটারিতে পাঠিয়ে দিন। লেজ না গজালে কিছু উড়ে যায় না ডাঃ বুচার। লেজে তেজস্ক্রিয় কিছু উড়ে এসে ঠিক লেগে গেছে।"

বুচার হাসিমারার এমন বিজ্ঞানীসুলভ কথাবার্তায় একেবারে অভিভূত। যদি তিনি দয়া করে ম্যাণ্ডেলার কেসটা এবারে হাতে তুলে নেন।

হাসিমারা যেন উপদেশের ভঙ্গিতে বলে যাচ্ছিলেন, "শিশুরা বড়ই কল্পনাপ্রবণ। সে যা ভাবে তাই দেখে। আমরা বড়রা তা দেখি না।" তার পর ম্যাণ্ডেলার দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছিল তাঁর, এই সব জীবনের গূঢ় কথাবার্তার মধ্যে এমন একটা ছোট্ট মেয়ের উপস্থিতি বাঞ্ছনীয় নয়। ম্যাণ্ডেলাকে বলেছিলেন, "তুমি যাও। খেলোগে।" ম্যাণ্ডেলা এক দৌড়ে চলে গেছিল। তিনি যখন দেখলেন দূরত্ব ঠিক বজায় আছে তাঁর সঙ্গে ম্যাণ্ডেলার, তখন তিনি বলতে থাকলেন, "আপনার ভাগ্নির কাছে এই মুহূর্তে আমি একটা শিলমাছ ছাড়া কিছু নয়। আপনার ভাগ্নির শখ পাখি হয়ে উড়ে যাবে বাতাসে। বাবাকে সে খুঁজে আনবে। অবশ্য এটা যে কেবল আপনার ভাগ্নির বেলায় হয়েছে তা নয়। সকলের বেলাতেই ঘটে থাকে। আপনার আমার শৈশবের কথা ভাবুন। পৃথিবীটা এত গোলমেলে জায়গা কে বুঝত তখন ! আসলে কী জানেন, সব শিশুরাই পাখি হয়ে উড়তে চায়। ওরা পাখি হয়ে গেছে এমন স্বপ্ন দেখে। ওরা প্রায় সময় বাতাসে ভেসে একটা ছাদ থেকে আর একটা ছাদে গিয়ে বসে, কখনও আপেলের বাগানে ঘুরে বেড়ায়। কখনও রাজপথে, ওদের কেউ দেখতে পায় না। কী মজা বলুন !"

॥ আট ॥

ম্যাণ্ডেলা খাওয়া-দাওয়া সেরে কখন বুড়োমানুষটার সঙ্গে গল্প করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছিল খেয়াল নেই। জেগে দেখে বুড়োমানুষটা নেই। হাইতিতি নেই। প্রথমে খুব হকচকিয়ে গেল। গেল কোথায় ! সে উপর থেকে উঁকি দিতেই দেখল অনেক দূর থেকে ওরা বাওবাব

গাছটার দিকে ফিরে আসছে। কাছে আসতেই বলল, "কোথায় গেছিলে ? একা আমার ভয় করে না।"

বুড়োমানুষটার মুখে ভারী খুশি-খুশি ভাব। গাছের গোড়া থেকেই বলল, "পেয়েছি।"

"কী পেয়েছ ?"

"পালকের টুপি। রুপোলি ঘণ্টা।"

এ মা, সে ভুলেই গেছিল তার পালকের টুপি হারিয়েছে।

"কোথায় পেলে !"

"কোথায় আবার। যেখানে ভয়ে মূর্ছা গেছিল।"

ম্যাণ্ডেলার আর ভয় নেই। বুড়োমানুষটার জন্য সত্যি কষ্ট হতে থাকল। সে চলে যাবে, বুড়োমানুষটা একা পড়ে থাকবে। তাকে কত আদর-যত্ন করেছে। কত রকমের ফল, মধু দিয়ে মণ্ডের পিঠা, দারুচিনি এলাচ দিয়ে পাখির বাসার স্যুপ—এত সুস্বাদু খাবার আছে এর আগে সে জানতই না। প্রকৃতি যেন সব বুড়োমানুষটার জন্য থরে-থরে বানিয়ে রেখেছে।

সে দেখল, একটা ডালে তার সাদা ফ্রকটা ঝুলছে। হাত দিয়ে বুঝল শুকিয়ে গেছে।

বুড়োমানুষটা ডাকছে এখন, "নীচে এসো।"

খেতে বসে বুড়োমানুষটা বলেছে, "এমন সব পাখি আছে ম্যাণ্ডেলা যারা বাড়িঘর বানাতে ওস্তাদ। তুমি দেখবে না ! আমি তো রোজ বিকেলে বসে দেখি। পাখিগুলি শুধু চালাঘরই বানায় না, বাগান করে। নানা রঙের ফুল এনে বাড়ির সামনে সাজিয়ে রাখে। তাদেরও অতিথি বেড়াতে আসে। তারা সমস্বরে গান গায়। নাচে, একজন মানুষ তার বিকেলটা পাখিদের ঘর সাজানো বাগান সাজানো দেখতে দেখতেই দ্বীপে

শীতের চিঠি

কলকাতা
৬-১-৮৪

বাবা,

কাল মার সঙ্গে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে বেড়িয়ে এলাম আমি আর টুকুম। সবচেয়ে মজা হলো ওখানেও শান্তিনিকেতনের মত কতগুলো লাল চন্দন বীচির গাছ পাওয়া গেছে। আমরা অনেক কুড়িয়েছি।

সামনের রোববারে মার সঙ্গে আবার যখন ঝিলমিলে বেড়াতে যাবো তখন সঙ্গে করে কতগুলো চন্দন বীচি নিয়ে যাবো। আচ্ছা বাবা ঝিলমিলে চন্দন বীচি পুতে দিলে ওরকম গাছ হবে তো ? তুমি কিন্তু চিঠিতে জানিও ঠিক। আর আমাদের ডালিয়া গাছে কুঁড়ি এসেছে। গত বর্ষায় লাগানো সব গাছগুলো বেশ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। ফুটপাথের কৃষ্ণচূড়াটা ঝাঁকড়া হয়ে উঠেছে। তুমি এসে দেখবে আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তাটা-ও কেমন সারানো হয়ে গেছে। কাগজে নিশ্চয়ই দেখেছো পার্কষ্ট্রীট থেকে রবীন্দ্রসদন পর্যন্ত মেট্রো রেল চালু হবে শিগ্‌গিরই। মা বলেছেন ঝিলমিল-এ গিয়ে যতবার খুশী টয়ট্রেন চড়বো আমরা। আর সাপের খাঁচা তো আছেই। আচ্ছা বলতো কলকাতায় অনেকগুলো ঝিলমিল নেই কেন ?

প্রণাম নিও।
গৌতম

(জনসংযোগ বিভাগ, সি এম ডি এ,
৩এ, অকল্যাণ্ড প্লেস, কলকাতা-১৭ থেকে প্রচারিত)

অনেক সময় কাটিয়ে দিতে পারে।"

এই বাড়িঘর বানানোর কথা বলতে বলতে বুড়োমানুষটা কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেছিল।

বুড়োমানুষটা ডাকল, "যাবে না? ওখানে দাঁড়িয়ে থাকলে হবে।"

আসলে একজন বুড়োমানুষ কোনো নির্জন দ্বীপে মুহূর্তে কত প্রিয় হয়ে যেতে পারে ম্যাণ্ডেলাকে না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। সে প্রায় ডাল থেকে ডালে নেমে তারপর নীচে ঝুলে বলল, "এখন গেলে দেখতে পাব?"

"চলোই না। তোমাদের দেখলে আবার লজ্জা পেয়ে না উড়ে যায়। আমরা কিন্তু কাছে যাব। মুরহেন পাখির মতো দেখতে। বুকটা সাদা, লেজটা লাল, ডানা সবুজ। ঠোঁট সোনালি। চিরিক-চিরিক করে নাচে গায়। ওরা যখন শিস দেয় সহসা শুনলে মনে হবে কোনো হলঘরে নূপুর বাজছে।"

"তাই বুঝি। ম্যাণ্ডেলা যেতে যেতে বলল, "আমাদের সঙ্গে চলো না। তোমাকে ফেলে যেতে আমার খুব কষ্ট হবে।"

"আবার এসো। যখনই ইচ্ছে হবে চলে আসবে। তোমার তো পালকের টুপি আছে, ভয় কী।"

"আমার বাড়ি ছাড়া আর এই দ্বীপটা বাদে কোথাও গিয়ে ভাল লাগবে না।"

"তোমার বাড়ি কোথায় গো?" ম্যাণ্ডেলা প্রশ্ন করল।

বুড়োমানুষটা বলল, "লিখে রেখেছি। দেখাব। গত জন্মের কথা তো! ঠিকঠাক মনে থাকে না। মাঝে মাঝে সব ভুলে যাই। তুমি আসায় কেমন আবার সব মনে পড়ে যাচ্ছে।"

কিছু ওক গাছের ছায়া তখন তাদের ঢেকে দিয়েছে। একটা ছোট অরণ্যের ভিতর দিয়ে তারা হাত ধরাধরি করে হেঁটে যাচ্ছিল। যেন এটা তাদের এক জীবনের বন্ধুত্ব নয়। কয়েক জীবনের বন্ধুত্ব।

একটা সবুজ ঘাসের মাঠে পড়তেই বুড়োমানুষটা বলল, "এখানটায় বোসো। ছায়ার মধ্যে বসলে আমাদের ওরা দেখতে পাবে না। সামনেই সেইসব পুতুল খেলার মতো কিংবা লিলিপুটদের থাকার মতো ঘর। বোলতার চাকের মতো আকারে বড়। কাঠের ডাল দিয়ে খুঁটি। যার যার সীমানা ভাগ করা। ফুলের বেড়া, যেন এই মাত্র ফুল তুলে এনে রেখেছে।

বুড়োমানুষটা আধশোয়া হয়ে ঘাসের মধ্যে বসে আছে। পায়ের কাছে ম্যাণ্ডেলা। অবাক চোখে দেখছে। হাইতিতি এখন ভারী শান্তশিষ্ট।

বুড়োমানুষটা বলল, "সকাল হলে এরা ঠোঁটে করে বাসি ফুল সমুদ্রে ফেলে দিয়ে আসবে। সকালটা এদের এই করে কাটে। দুপুরে বাসা থেকে বের হবে না। বাচ্চা পাখি নিয়ে ঘরকন্না করবে। বিকালে আবার বের হবে। এখন বাগান সাজানোর পালা। ভাল লাগছে না ম্যাণ্ডেলা। এই পাখিগুলি না থাকলে আমি বড় একা হয়ে যেতাম।"

"আমাকে একটা ধরে দেবে?"

"নিতে নেই। নিয়ে গেলে ওরা একা হয়ে পড়বে না।"

ম্যাণ্ডেলা আর কিছু বলল না। সেজেগুজে যেন পাখিরা এখন তাদের নিজ-নিজ বাগান করায় ব্যস্ত। ফুল দিয়ে বাড়িঘর কিংবা লতাপাতার মতো চারপাশে আলপনা দিয়ে রাখছে। কী ব্যস্তবাগীশ সব। ম্যাণ্ডেলার হাসি পেয়ে গেল। বলল, "এগুলো কী পাখি গো?"

"নাম জানি না, আমি গার্ডেনার বলে ডাকি।"

"মামাকে গিয়ে বলব। কিন্তু কী জানো, মামাটা বিশ্বাস করে না। আর শোনো, তুমি কিন্তু কাউকে বোলো না, আমার পালকের টুপি আছে। অবিশ্বাসী লোকেরা শুনলে পালকের গুণ নষ্ট হয়ে যাবে।"

"তুমি পাগল! আমি কাকে বলব! কে

আমার আছে ?"

পাখিদের ঘরকন্না দেখার কী অসীম আগ্রহ বুড়োমানুষটার। ম্যাণ্ডেলাই মনে করিয়ে দিল, আমরা যাব। ম্যাণ্ডেলা মনে মনে ভাবছে—বুড়োমানুষটাকে যদি সে বাড়ি পৌঁছে দিতে পারত। যাবার কথা মনে হলেই তার কেমন কান্না পাচ্ছে।

ওরা হাঁটতে-হাঁটতে ফের বাওবাব গাছটার নীচে এসে দাঁড়াল। আট-দশ বিঘা জমি জুড়ে গাছটা ডালপালা মেলে দাঁড়িয়ে আছে। কাঠাখানেক জমি জুড়ে তার অতিকায় কাণ্ড—কাণ্ডটার খুব কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই ম্যাণ্ডেলা দেখল—সারা কাণ্ড জুড়ে মুক্তোর মতো অক্ষরে কে কী সব লিখে রেখেছে। প্রথমে বড় বড় করে লেখা—

আমার নাম হানস ওটো।

তারপরে লেখা—আমার গাঁয়ের নাম, ওবের আমেরগাউ।

আমার মেয়ের নাম, রোমি।

আমার ছোট্ট খামার ছিল, ছোট্ট নদী ছিল। শস্যক্ষেত্র ছিল। রোমিকে নিয়ে বিকেল হলে নদীর ধারে বেড়াতে যেতাম। রাতে উঠোনে বসে নক্ষত্র চেনাতাম। জঙ্গলের কত সব মজার গল্প শুনে রোমি আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেত। মারিয়া কপট ক্ষোভ প্রকাশ করে বলত, আঃ কী বাপসোহাগি মেয়ে দেখো ! আমি না খাইয়ে দিলে রোমি খেত না। ঘুম থেকে ডেকে না দিলে উঠত না। হাত ধরে স্কুলে না দিয়ে এলে যেত না।

এক জায়গায় লিখে রেখেছে—ঈশ্বর আমার একটা মাত্র মেয়ে। তাকে আমি আর দেখতে পাব না। ওর জন্য সুন্দর একটা পাতার পোশাক বানিয়ে রেখেছি। তারপর লিখে রেখেছে, আমার এমন সুন্দর জীবন যেসব যুদ্ধবাজ নষ্ট করে দিল, ঈশ্বর তাদের তুমি ক্ষমা করে দিও।

ম্যাণ্ডেলা লেখাগুলি পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তার বাবাও হয়তো কোনো গাছের কাণ্ডে এভাবে লিখে রেখেছে যাবতীয় কথা। আমার মেয়ের নাম, ম্যাণ্ডেলা। আমাদের বাড়ি গ্রিন ভ্যালিতে। উপত্যকার নীচে পাইনের বন। পেছনে এগমণ্ট হিল। পাহাড়ের গায়ে অজস্র আপেলগাছ। পিকাকোরা পার্কে রোজ বিকেলে ম্যাণ্ডেলার হাত ধরে বেড়াতাম।

ম্যাণ্ডেলা ফ্রকে চোখ মুছে ফের বুড়োমানুষটাকে দেখার চেষ্টা করল। বুড়োমানুষটার মুখ দেখা যাচ্ছে না। কেমন সাদা বরফের মতো শরীর। বুড়োমানুষটার শরীর থরথর করে কাঁপছে। ম্যাণ্ডেলার কাছে ধরা পড়ে যাবে, ভয়ে মুখ ঘুরিয়ে রেখেছে। ম্যাণ্ডেলা সামনে গিয়ে এবারে বুড়োকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরল। ডাকল, "হানস, ওঠো !"

বুড়োমানুষটা বুকে তুলে তাকে পাগলের মতো চুমো খেতে থাকল।

"হানস ওঠো, আমি তোমাকে তোমার দেশে পৌঁছে দেব। দেখবে এখানে একদিন একটা সাদা জাহাজ এসে লেগেছে। ওতে উঠে তুমি চলে যাবে। আমাকে এখন ছেড়ে দাও। হাইতিতিকে নিয়ে যাচ্ছি। তোমার কাছে বলে যাচ্ছি, যুদ্ধবাজ লোকদের দেখলেই এবার থেকে আমি তাদের কান মলে দেব। তুমি ভেবো না। ভাববে না তো ! কান্নাকাটি করবে না, বলো। সাদা জাহাজটা এলে তুমি কিন্তু চলে যেও।"

বুড়োমানুষটা ফিক করে হেসে দিল। একেবারে সেই এক ছোট শিশু। ভারী অবোধ। বলল, "না, আর কান্নাকাটি করব না।"

"কান্নাকাটি আমার একদম ভাল্লাগে না।" তারপর সে হাইতিতিকে নিয়ে বাতাস ফুঁড়ে মেঘের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ছবি : দেবাশিস দেব

নেহরু গোল্ড-কাপ পেল পোল্যাণ্ড

শ্যামসুন্দর ঘোষ

কলকাতার ঘরোয়া ফুটবলে পয়েন্ট দেওয়া-নেওয়ার খেলা দেখতে-দেখতে যখন ক্রীড়ামোদীরা ক্লান্ত, বিরক্ত, সেই সময় এ-রাজ্যের বুকে নেহরু ফুটবলের আসর শুধু যে ভারতের ফুটবলকে সমৃদ্ধ করল তা নয়, বিদেশীদের কাছে ভারতীয় ফুটবলের পরিচয় লাভের একটা সুযোগ এনে দিল।

বিদেশীরা ভারতীয় ফুটবল সম্বন্ধে যে বিশেষ কিছুই জানেন না, সে-কথা স্পেন থেকে ফিরে এসে আনন্দমেলার পাঠকদের জানিয়েছি। এবারের বিশ্বকাপে পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গারির প্রশিক্ষক অ্যাণ্টনি পিচিংচেক ও কালমান মেজজলি দুজনেই প্রতিযোগিতা চলাকালে একাধিকবার স্বীকার করেছেন যে, ফুটবল যে এ-রাজ্যে এত জনপ্রিয় খেলা তা তাঁরা আদৌ জানতেন না। মেজজলি জানিয়েছিলেন, গতবারের হাঙ্গারি দলের খেলোয়াড়েরা দেশে ফিরে এই টুর্নামেণ্ট সম্বন্ধে এমন কথা বলেছিলেন, যার ফলে তাঁর ধারণা হয়েছিল, নেহরু ফুটবল প্রতিযোগিতা একটি অপেশাদারি মাঝারি ধরনের টুর্নামেণ্ট। সেই ধারণা এবারে পালটেছে। দুই প্রশিক্ষকই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, ভবিষ্যতে খেলার ডাক পেলে তাঁরা তাঁদের শ্রেষ্ঠ দল নিয়ে আসবেন।

এবারের প্রতিযোগিতা আগের দুটিবারের প্রতিযোগিতা থেকে কিছুটা ভিন্ন। প্রথম নেহরু টুর্নামেণ্টে উরুগুয়ে

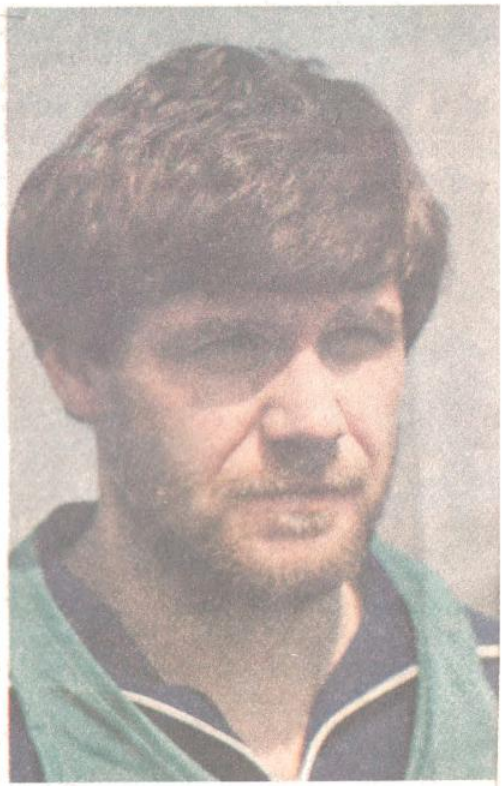

পোল্যাণ্ডের স্মোলারেক ফোটো : নিখিল ভট্টাচার্য

ছাড়া অন্য কোনো দল আমাদের মনের উপর বিশেষ ছাপ ফেলতে পারেনি। কোচিনে দ্বিতীয় নেহরু কাপ সম্বন্ধে যত কম বলা যায়, ততই ভাল। কারণ খেলা আরম্ভের একদিন আগেও আমরা জানতাম না কোন্ কোন্ দল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করছে। এবারের প্রতিযোগিতায় শেষমুহূর্ত পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষায় থাকতে হয়েছে, কোন্ দুটি দল ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। পোল্যাণ্ড যোগ্য দল হিসেবেই

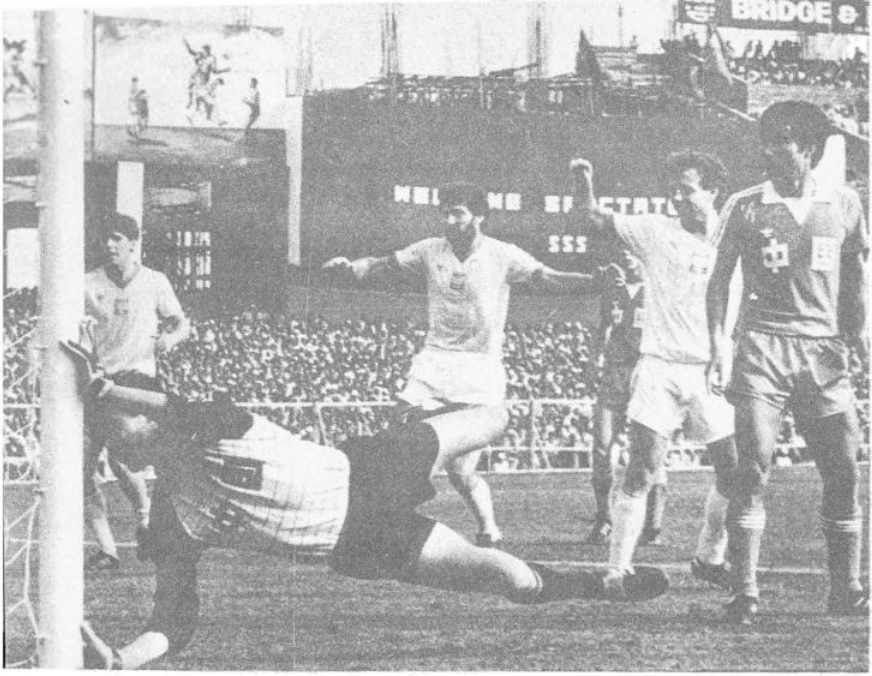

ফোটো : নিখিল ভট্টাচার্য

চিনের গোলে বল ঢুকেছে ; ফাইনালে এই একটি গোলেই পোল্যাণ্ড জিতে যায়

চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। গ্রুপের খেলাতেও চিনকে হারিয়েছে ১—০ গোলে। তবে তুলনামূলক বিচারে গ্রুপের খেলা থেকে ফাইনালেই চিন বেশি ভাল খেলেছে। ইউরোপীয় ও ল্যাটিন আমেরিকার বিরুদ্ধে খেলতে নামলে চিন যে বিশেষ সুবিধে করতে পারে না, তা আমরা অতীতেও দেখেছি। এবারের ফাইনালে চিনের খেলায় আগের খেলাগুলির মতো জড়তা ছিল না। গোলের সুযোগ পেয়ে অবশ্য তাঁরা সে-সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি।

প্রতিযোগিতা চলাকালে অনেকেই ভেবেছিলেন আর্জেন্টিনা ও পোল্যাণ্ড ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। গ্রুপ লিগের খেলায় এই দুটি দল মোটামুটি ভাবে ল্যাটিন্ আমেরিকা ও ইউরোপের ঘরানার কিছুটা তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিল। পোল্যাণ্ড দলে বিশ্বকাপের ছ'জন খেলোয়াড় প্রতিদিনই নেহরু ফুটবলে অংশ নিয়েছেন। স্মোলারেক, বুনসল ও রোমান দেখিয়েছেন, কত তাড়াতাড়ি প্রতিপক্ষের গোলে হানা দেওয়া যায়। পোল্যাণ্ডের খেলার বড়গুণ তাঁদের ক্রীড়াচাতুর্য। প্রথম থেকেই তাঁরা প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়দের উপর প্রভাব সৃষ্টি করতে পেরেছেন, ও বুঝিয়ে দিতে পেরেছেন যে, তাঁরাই প্রতিযোগিতার শ্রেষ্ঠ দল। কখনো ছোট পাসে, কখন বা বড় পাসে, কখনও বা বল নিজেদের মধ্যে নিয়ন্ত্রণে রেখে প্রায় সারাক্ষণই বিপক্ষ দলের উপর চাপ সৃষ্টি করেছেন তাঁরা। নেহরু ফুটবলে একাধিক পেশাদারি দল অংশ নিলেও প্রকৃত অর্থে পোল্যাণ্ডের

ক্রীড়াধারাতেই মনে হয়েছে যে, তাঁরা এই প্রতিযোগিতার শ্রেষ্ঠ দল।

আর্জেন্টিনার যে দলটি এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল, তাঁদের প্রশিক্ষক ও খেলোয়াড়দের—পোল্যাণ্ডের তুলনায়—আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা অনেক কম, অবশ্য সাম্প্রতিককালে এই দলের সাতজন খেলোয়াড় ব্রাজিলের জাতীয় দলকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছিল। ব্রাজিল দলে অবশ্য সেই খেলায় জিকো, ফালকাও, সিরেজোর মতো খেলোয়াড়রা ছিলেন না, তবু আর্জেন্টিনা দলের বেশ কিছু খেলোয়াড় ছিয়াশি সালে বিশ্বকাপে অংশ নেবেন, এমন সম্ভাবনা আগাম ঘোষণা করেছিলেন প্রশিক্ষক বিলার্ডো ও তাঁদের ফুটবল-সংস্থার সম্পাদক।

আর্জেন্টিনা এই প্রতিযোগিতায় তিনটি পয়েন্ট নষ্ট করেছে। চিনের কাছে পরাজয়ের ফলেই এই প্রতিযোগিতা থেকে তাদের বিদায় নিতে হয়। পোল্যাণ্ডের সঙ্গে তাদের অমীমাংসিত খেলা ক্রীড়াধারার সঙ্গতিসূচক ফলাফল হলেও চিনের কাছে পরাজয়ে যে শুধু আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়রাই বিস্মিত হয়েছেন, তা নয়, কলকাতার ক্রীড়ামহলও এই ফলাফলের জন্য মানসিক দিক দিয়ে প্রস্তুত ছিলেন না। তবু বলব, চিন আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে যে খেলা খেলেছেন, তাতে এশিয়াবাসী মাত্রেরই গর্বিত হওয়ার কথা।

বিশ্ব ফুটবলের আসরে এশীয় ফুটবলের মান যে অনেক নীচে, তার প্রমাণ, আজ পর্যন্ত ওলিম্পিক বা বিশ্বকাপ ফুটবলে কোনো এশীয় দেশ বিজয়ী হতে পারেনি। চিনের এই দলকেই তো গত

ফোটো : তারাপদ মুখোপাধ্যায়

গোল্ডকাপ হাতে পোল্যাণ্ডের অধিনায়ক

নভেম্বরে ব্যাঙ্ককে দেখেছিলাম প্রাক্-ওলিম্পিকে গ্রুপের প্রথম রাউণ্ডেই বিদায় নিতে। সেই চিনা দল যে ফাইনালে উঠল, তার কারণ, তাদের খেলোয়াড়দের দৃঢ়তা ও একাগ্রতা। কঠিন পরিশ্রমী চিনের ভাগ্য নির্ভর করছিল শেষদিনে ভারতের সঙ্গে খেলায়। জেতার জন্য প্রয়োজন তিনটি গোল। চিন যে শুধু তিনটি গোলে জিতেছে, তা নয়, আরও বেশি গোলে জিতলেও আশ্চর্য হবার কিছু ছিল না।

ভারত এই প্রতিযোগিতায় পয়েন্ট পেয়েছে মাত্র একটি, স্থান পেয়েছে সবার শেষে। তবে বিশ্বের সেরা সব ফুটবল দলের বিরুদ্ধে ভারত যা খেলা খেলেছে, তার প্রশংসা মিলেছে লোকের মুখে-মুখে। আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে

আর্জেন্টিনার গ্যারেকা ফোটো : নিখিল ভট্টাচার্য

ভারতের খেলা দেখে অনেকেই স্বীকার করেছেন, ভারতীয় দলের খেলোয়াড়দের আচরণে বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে। দীর্ঘদিন একসঙ্গে অনুশীলন করা সত্ত্বেও এশিয়ান গেম্‌সে ভারতীয় খেলোয়াড়দের খেলা দেখে কোনো সময়ের জন্যই মনে হয়নি যে, একটি সুসংবদ্ধ দল খেলছে। এবারে খেলোয়াড়েরা সারাক্ষণই স্থান পরিবর্তন করে খেলেছেন। প্রতিপক্ষকে কোনো সময়ের জন্য সুযোগ দেননি ফাঁকা জমিতে প্রভাব বিস্তার করতে। মিলোভানের তত্ত্বাবধানে ভারতীয় দলের খেলার যে প্রভূত উন্নতি ঘটেছে, সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

নেহরু ফুটবল বিভিন্নভাবে ভারতীয় ফুটবলকে সমৃদ্ধ করেছে। এতে একদিকে যেমন খেলোয়াড়, প্রশিক্ষক, দর্শক অনেক কিছু শিখতে পেরেছেন, তেমনি রেফারিরা উপলব্ধি করলেন, খেলার মাঠে তাঁরাই হচ্ছেন রাজা। আর সেই ক্ষমতার বলেই আর্জেন্টিনার জাতীয় কোচ বিলার্ডোকে রেফারি মাঠ থেকে বের করে দিয়েছিলেন। ভারতীয় ফুটবলে এই ধরনের চিন্তা করা তো দূরের কথা, খেলোয়াড়ের কাছেই মার খেয়ে রেফারিকে চুপ করে থাকতে হচ্ছে।

নেহরু ফুটবল চলাকালে বিভিন্ন রাজ্যের ফুটবল-সম্পাদককে নিয়ে এক আলোচনাচক্রের ব্যবস্থা হয়েছিল, কর্মসচিবের কাজে কীভাবে উন্নতি ঘটানো যায়। নিঃসন্দেহে এটি সাধু উদ্যোগ। আশা করব, যাঁরা এই আলোচনাচক্রের উদ্যোক্তা, তাঁরা নিশ্চয়ই কলকাতা ফুটবলের মানের এবং পরিবেশের উন্নতি ঘটানোর জন্যে বিশেষ সচেষ্ট হবেন। কলকাতা ফুটবলের উন্নতি ব্যতিরেকে ভারতীয় ফুটবলের উন্নতি সম্ভব নয়।

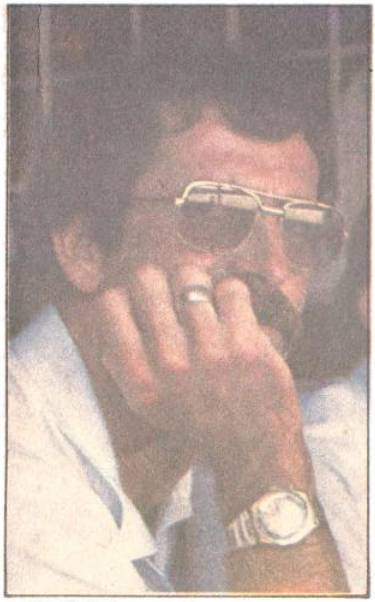

ডেনিস লিলি (দুরন্ত বল)

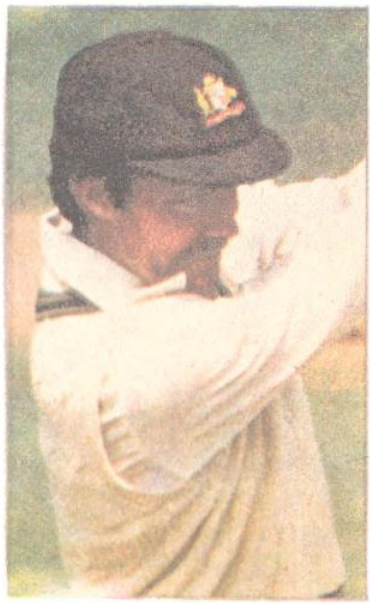

গ্রেগ চ্যাপেল (দুরন্ত ব্যাট)

বিদায়, ক্রিকেট

অশোক রায়

ভাবতে সত্যিই কষ্ট হচ্ছে গ্রেগ চ্যাপেলের সুন্দর ব্যাটটি আর কখনও টেস্ট ক্রিকেটের সাজানো আসরে ঘাসের বুকে রানের নক্‌শা আঁকবে না। এবং ডেনিস লিলির হাত থেকে ছাড়া-পাওয়া চক্‌চকে লাল বলটি আর কখনও ছুটে আসবে না বিপক্ষ ব্যাটসম্যানকে বিপন্ন করতে। হ্যাঁ, আর কখনও না। টেস্ট-ক্রিকেট থেকে ছুটি নিলেন বিশ্বশ্রেষ্ঠ দুই অস্ট্রেলিয় ক্রিকেটার গ্রেগ চ্যাপেল এবং ডেনিস লিলি। দুটি স্থির সিদ্ধান্ত। কিন্তু কী বেদনাদায়ক!

১৯৭০ সালে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে পার্থে জীবনের প্রথম টেস্টেই সেঞ্চুরি দিয়ে শুরু করেছিলেন গ্রেগ। চমৎকার ঝকমকে সূচনা। ১৯৭২ সালে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে লর্ডসে প্রথম খেলতে নেমেও গ্রেগ শতরান করেছিলেন। ১৯৭৩-৭৪ সিরিজে নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে ওয়েলিংটনে গ্রেগের ব্যাট ঝলসে উঠেছিল। রান করেছিলেন ২৪৭ এবং ১৩৩। একটি টেস্টে একাই ৩৮০ রান করার নজিরটি আজও বিশ্বরেকর্ড হিসেবে স্বীকৃত। ১৯৭৫-৭৬ সিরিজে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ব্রিজটাউনে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক নির্বাচিত হবার মুহূর্তটি

দারুণভাবে 'সেলিব্রেট' করেছিলেন গ্রেগ দু'-ইনিংসে দুটি দুর্দান্ত সেঞ্চুরি করে। পৃথিবীর আর কোনো ক্যাপ্টেন আবির্ভাবেই এমন কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি। ক'দিন আগে শেষ টেস্ট খেললেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সিডনিতে। জীবনের শেষ টেস্টটিকেও সেঞ্চুরির উজ্জ্বলতায় পূর্ণ করলেন গ্রেগ। এবং শেষ টেস্টেই আরও দুটি রেকর্ড উঠে এল গ্রেগের ঝুলিতে। অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটে সর্বাধিক রানের (৬৯৯৬) রেকর্ডটি দীর্ঘদিন ছিল স্যার ডন ব্রাডম্যানের দখলে। এখন গ্রেগ চলে এলেন এক নম্বরে। আর ক্যাচ ধরায় ইংল্যাণ্ডের কলিন কাউড্রের বিশ্বরেকর্ডটি (১২০টি) ভেঙে দিলেন গ্রেগ (১২২টি)।

গ্রেগের সঙ্গে আরও এক দুর্দান্ত ক্রিকেটার সরে দাঁড়ালেন ক্রিকেট থেকে। তিনি ডেনিস লিলি। দুরন্ত গতি এবং নিয়ন্ত্রিত সুইংয়ের কারিকুরিতে যিনি এ-যুগের সর্বোত্তম ফাস্ট বোলার হিসেবে একইসঙ্গে ব্যাটসম্যানদের শ্রদ্ধা এবং সমালোচকদের প্রশংসা অর্জন করেছেন। টেস্টে হাইয়েস্ট উইকেট - টেকারের মুকুটটিও (৩৫৫টি) এখন লিলির মাথায়। এক ইনিংসে পাঁচ উইকেট নেবার কৃতিত্ব লিলি অর্জন করেছেন ২৩ বার। সংখ্যাটি ইংল্যাণ্ডের সিড বারনেসের গড়া বিশ্বরেকর্ডের (২৪ বার) ঠিক পরেই। টেস্ট-পিছু লিলি গড়ে উইকেট নিয়েছেন ৫·০১। এইরকম দুর্ধর্ষ অ্যাভারেজ ইদানীংকালের আর কোনো বোলারের নেই।

গ্রেগ এবং লিলি টেস্ট-ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়ালেন। কিন্তু দুটি নামের মধ্যে রয়ে গেল ক্রিকেটের এক ঝক্‌মকে ইতিহাস।

ক্যাপ্টেনের কৃতিত্ব

সম্রাট রায়

অন্তত কলকাতায় দুর্দান্ত সেঞ্চুরিটি দেখার পরে কারুর মনেই আর সন্দেহ থাকার কথা নয় ব্যাটসম্যান হিসেবে ক্লাইভ লয়েড কোন্ জাতের। এই সিরিজ প্রমাণ করে দিল ক্রিকেট-জীবনের সায়াহ্নে পৌঁছেও লয়েডের ব্যাটে মরচে ধরেনি।

কিন্তু শুধু ব্যাটের দাপটেই নয়, অধিনায়ক হিসেবেও লয়েড ক্রিকেট-বিশ্বের নজর কাড়লেন এই সিরিজে। এ- যাবৎ লয়েড ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে নেতৃত্ব দিলেন মোট ৬০টি টেস্টে। ক্রিকেটের ইতিহাসে আর কোনো ক্রিকেটারেরই এতগুলো টেস্টে অধিনায়কত্ব করার রেকর্ড নেই। টেস্টে সর্বাধিকসংখ্যক ক্যাপ্টেনশিপের রেকর্ড ছিল ইংল্যাণ্ডের পিটার মের (৪১ বার)।

লয়েডের অধিনায়কত্বে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জিতল সবসমেত ২৫টি টেস্টে। সর্বাধিক টেস্ট জয়ের এটিও এক বিশ্বরেকর্ড। অধিনায়ক হিসেবে লয়েড এ-পর্যন্ত রান করেছেন ৪,৪০২। এত রানের ঐশ্বর্য পৃথিবীর অন্য কোনো ক্যাপ্টেনের ব্যাটে নেই। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি ক্যাপ্টেন হিসেবে লয়েডের শুরুটাও ঝকঝকে সেঞ্চুরি দিয়ে সাজানো। ১৯৭৪-৭৫ সিরিজে ভারতের বিরুদ্ধে ব্যাঙ্গালোরে অধিনায়কত্ব হাতে পেয়েই লয়েড করেছিলেন অপরাজিত ১৬৩।

লয়েডের পাশাপাশি কয়েকজন সেরা ক্যাপ্টেনকে একটু দেখে নেওয়া যাক। গ্রেগ চ্যাপেল এ-পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়াকে

নেতৃত্ব দিয়েছেন ৪৮টি টেস্টে। এর মধ্যে অস্ট্রেলিয়া জয় পেয়েছে একুশটি ক্ষেত্রে। নজিরটি অস্ট্রেলিয় অধিনায়কদের মধ্যে সর্বোত্তম। ক্যাপ্টেন গ্রেগের ব্যাট টেস্টে সংগ্রহ করেছে ৪২০৯ রান। সংখ্যাটির অবস্থান বিশ্বরেকর্ডধারী লয়েডের পরেই। অধিনায়ক হিসেবে গ্রেগের আবির্ভাবটিও অভিনব। ১৯৭৫-৭৬ সিরিজে শক্তিশালী ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ব্রিসবেনে অধিনায়ক গ্রেগ দু-ইনিংসেই দুটি সেঞ্চুরি হাঁকান। ক্যাপ্টেন হিসেবে আবির্ভাবেই দু-ইনিংসে শতরানের গৌরব আর কারুর নেই।

ক্যাপ্টেন হিসেবে টেস্টে তিন হাজারের বেশি রান করার কৃতিত্ব যাঁদের ঝুলিতে তাঁরা হলেন— অস্ট্রেলিয়ার ববি সিম্পসন ৩৬২৩ (৩৯টি টেস্টে), ডন ব্রাডম্যান ৩১৪৭ (২৪টি টেস্টে), ইংল্যাণ্ডের পিটার মে ৩০৮০ (৪১টি টেস্টে), ওয়েস্ট ইণ্ডিজের গ্যারি সোবার্স ৩৫২৮ (৩৯টি টেস্টে) এবং ভারতের সুনীল গাওসকর ৩১৮৯ (৪০টি টেস্টে)।

গাওসকর অধিনায়ক হিসেবে প্রথম টেস্টেই সেঞ্চুরি করেছিলেন নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯৭৫-৭৬ সালে অকল্যাণ্ডে। চল্লিশটি টেস্টে অধিনায়কত্ব করার যুগ্ম ভারতীয় রেকর্ডটি ছাড়াও সমস্ত টেস্ট প্লেয়িং দেশের বিরুদ্ধেই সেঞ্চুরি এবং ক্যাপ্টেনশিপ করার বিশ্বরেকর্ড রয়েছে একমাত্র সানির দখলে। ভারতের বর্তমান ক্যাপ্টেন কপিলদেবও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে এই সিরিজে একটি বিশ্বরেকর্ড গড়লেন। আমেদাবাদে কপিলের ৮৩ রানে নয় উইকেট নেবার দৃষ্টান্তটি টেস্ট ক্রিকেটে একজন ক্যাপ্টেনের সর্বোত্তম বোলিং-কীর্তি হিসেবে চিহ্নিত হল।

শিল্পী : সুদীপ চট্টোপাধ্যায় (বয়স ৭)

ছোটদের ছবি

সম্প্রতি রিজেন্ট পার্কের লক্ষ্মী হাউসে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম আয়োজিত একটি ছোটদের জন্যে বসে-আঁকো প্রতিযোগিতা ও একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছিল।

আশ্চর্য লাগে, মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে কেমন করে খুদে শিল্পীরা ঝপাঝপ রঙ চাপিয়ে সুন্দর-সুন্দর ছবি এঁকে ফেলে।

প্রতি বছর জানুয়ারিতে লক্ষ্মী হাউসে ছোটদের আঁকার প্রতিযোগিতা হয়। এটি শুধু স্থানীয় শিশু-শিল্পীদেরই কাছেই নয়, বেশ দূর-দূরের ছেলেমেয়েদের কাছেও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠান হয় বাগান ঘেরা মস্ত সবুজ মাঠে। ছবি আঁকার মতই পরিবেশ বটে। আশ্রম-পরিচালিত একটি আর্ট স্কুলও আছে, ছাত্রছাত্রীদের কেমন উন্নতি হচ্ছে বার্ষিক প্রদর্শনীর মাধ্যমে তা জানা যায়। দারুণ পাকা টানটোন মাঝে-মাঝে চমকে দেবার মতো, আর বিষয়বস্তুর নানান রূপ-- কখনও পৌরাণিক চিন্তা, কখনও একেবারে আজকালকার সমস্যা, কখনও বা নিছক গাছপালা, মেঘ, আকাশ আর নদী : আবার কখনও বা শুধুই প্রতিকৃতি।

অহিভূষণ মালিক

REACT- B-5/84 BEN

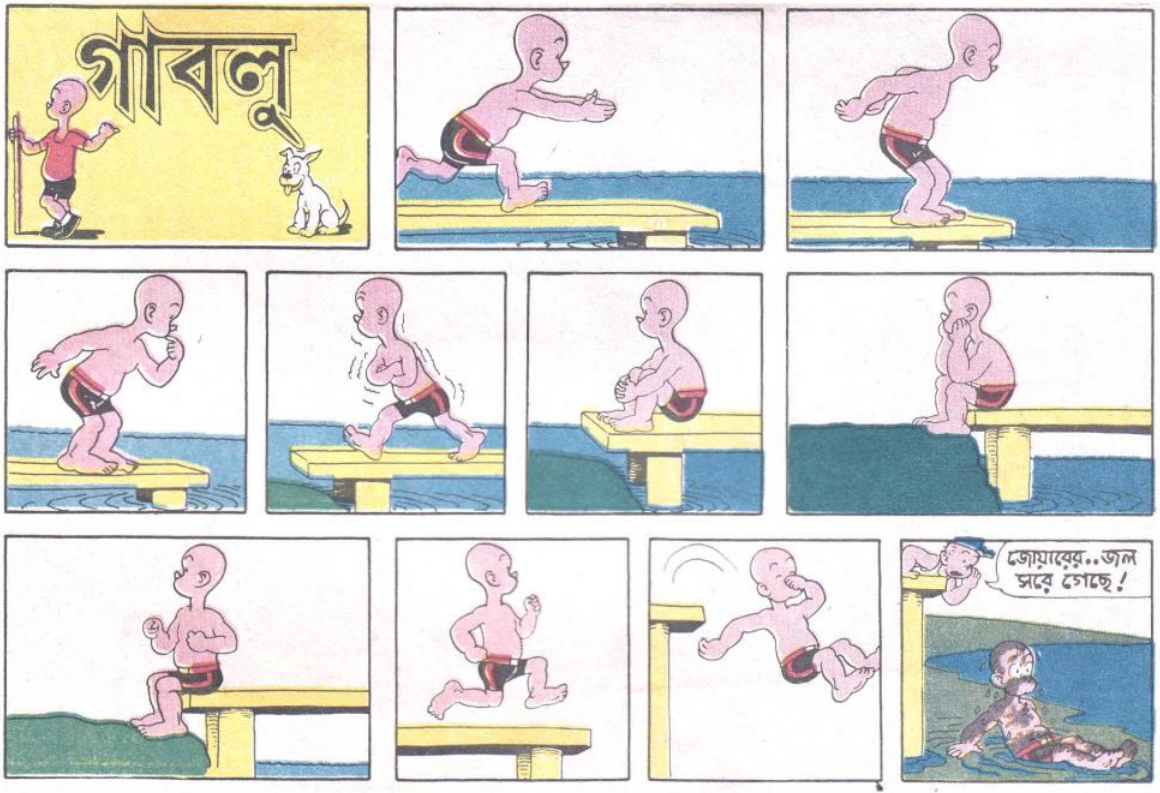
গাবলু
জোয়ারের..জল সরে গেছে!

বাংলা শ-র রাজ্যপাট

বাচস্পতি

"এইবার এক গামলা কালো কফি, পঁচাশিটা ফুলকপির বড়া, খান-সাতষট্টি নলেনগুড়ের সন্দেশ নিয়ে এসো—" স-এর পালা শেষ করে হিগিনকাকু হুংকার দিলেন, "রান্নাঘরমে কোই হ্যয় !" বলে সোফায় এলিয়ে পড়ে চোখ বুজে ফেললেন। ভণ্টু ভাবল, এবার বুঝি কাকু একটু নাক ডাকিয়ে নেবেন। কিন্তু ঠিক সতেরো সেকেণ্ড থেকে চোখ বোজা অবস্থাতেই জিজ্ঞেস করলেন, "তাহলে জনগণ, ইংরিজি s-এর মতো স্ কোথায় কোথায় পাই আমরা বাংলায়, আরেকবার হয়ে যাক বাবা।"

ভণ্টু বুঝল, প্রশ্নটা তাকেই করা হচ্ছে। সে খাতায় টুকে রেখেছিল একটু-আধটু, তা খুলে বলতে লাগল, "এক নম্বর, বিদেশী শব্দের সঙ্গে যে s-জাতীয় ধ্বনি আছে, সেগুলো বাংলায় এসে স্ট্যাণ্ডার্ড উচ্চারণে মোটামুটি s-ই থেকে যায়…"

"গুড ! অতঃপর ?"

"দু নম্বর, ত্ থ্ ন্ র্ ল্-এর আগে যে-শ-ই যুক্ত হোক না কেন সর্বত্র তার উচ্চারণ s বা স্।"

"গুড ! কোনো ব্যতিক্রম আছে ?"

"হ্যাঁ, 'প্রশ্ন' কথাটা। উচ্চারণ প্রোস্নো হওয়া উচিত ছিল, অনেকে বলেও, কিন্তু প্রোশ্নো আজকাল বেশি মার্জিত শোনায়।"

"ইনক্রেডিব্‌ল ! তিন নম্বর ?"

"তিন হল, শব্দের গোড়ায় দন্ত্য-স-এর সঙ্গে ক্, খ্, প্, ফ্-এর যুক্তব্যঞ্জন থাকলে সে দন্ত্য-স-এর উচ্চারণ ঐ দন্তমূলীয়, s-এর মতো ; কিন্তু ঐ একই যুক্তব্যঞ্জন যদি শব্দের মাঝখানে থাকে তাহলে স্-এর উচ্চারণ হবে শ্-এর মতো।"

"বিউটিফুল ! আর স্ম-এর কেস্‌টা ?"

এবার বাবা মুখ খুললেন। বললেন, "তোর কথা থেকে যা বুঝলাম, পশ্চিমবাংলার পুরনো স্ট্যাণ্ডার্ড উচ্চারণে স্ম 'শঁ'-এর মতো উচ্চারণ হত—স্মিত=শিঁতো, এমন-কী শুচিস্মিতা= শুচিশ্‌শিঁতা। কিন্তু আজকাল আমরা অনেকে ম রেখে উচ্চারণ করছি। তখন শব্দের গোড়ায় স্ম-এর স s-এর মতো হচ্ছে, মাঝখানে তা শ্। আমার প্রশ্ন এই, নতুন ধরনের উচ্চারণ কেন করছি আমরা ?"

"চমৎকার প্রশ্ন করেছ ভাই বড়দা। আমরা বানান ধরে উচ্চারণ অর্থাৎ স্পেলিং প্রনান্‌সিয়েশন করছি বলেই এই নতুন উচ্চারণ জেগে উঠছে। এবার বলো বাংলা উচ্চারণে মূর্ধন্য-ষ্ কোথায় পাই ?"

ভণ্টু বলল, "কেবল ট-ঠ-এর আগে।"

"শাবাশ বীর গাজী পীর !" বলে উচ্ছ্বাস করে উঠলেন হিগিনকাকু। তখনও চোখ বুজে।

ভণ্টু বলল, "কিন্তু কাকু, জানা হল না যে শ্ কোথায় কোথায় আছে !"

"সব জায়গায় আছে বাপ্, সব জায়গায়। অযুক্ত ব্যঞ্জনে বিদেশী শব্দে ছাড়া আর সব স-ই শ্। 'ষণ্ডটি ফোঁস ফোঁস করে শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে সারমেয়টিকে শাসন করতে ছুটে গেল'—এই কথাটার সবগুলো স-ই, শ- ষ- স সব—তালব্য শ। বাংলা উচ্চারণে তালব্য-শ'টি জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সর্বত্র আছেন।" বলে চোখ খুলে বললেন, "কই রে, কফি এল ? এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গ ?" (ক্রমশ)

হলে ভাল হত

প্রসাদ

Sometimes Milly wishes she had a sister.

She actually wrote in her diary once: I wish I had a little sister.

We already know of Milly's diary.

She writes in it her secret thoughts and wishes.

Once she was very angry with Chambal and wrote in her diary: I *hate* Dada.

But the very next day she wrote: I wish I hadn't written that. I hated Dada. He brought me a chocolate today. It was very nice, but it was finished too quickly. I wish it were bigger.

তা তো হল, কিন্তু বোন থাকলে ভাল হত, এ-কথা মিলি কেন লিখল ? তার কি বাড়িতে একা-একা লাগে ? সঙ্গীর অভাব ? কেন, দাদাই তো আছে। অবশ্য দাদার সঙ্গে মাঝে মাঝে ঝগড়া হয়, কিন্তু মজাও তো হয় খুব। এক এক সময় এমন হুল্লোড় হয় দু'জনে যে, মা বলেন, এবারে পাড়ার লোকেরা পুলিশ ডাকবে।

So, it's not as if Milly had no companion at home.

She has a lot of fun with Chambal.

Still, she thinks it would be nice if she had a sister.

We all have such wishes.

Chambal, in his turn, probably wishes he had a little brother.

If he wrote down his wishes in a diary, he would probably write about that.

মিলি ভাবে, দাদার সঙ্গে মজা তো হয় ঠিকই, কিন্তু বোন থাকলে আরেক রকমের মজা হত।

She and her sister would then sleep together and talk till *very* late in the night.

She would teach her sister many things.

Whenever Milly learns something new she wishes that she had some one to whom she could teach it.

You can't teach Dada anything. He knows everything.

Milly wishes he didn't.

এবারকার বাক্যগুলোতে যা বিশেষভাবে লক্ষ করবার, তা হল, ক্রিয়াপদের যে অতীতকালের রূপ, তার এক বিশেষ ধরনের ব্যবহার।

প্রথমে নীচের বাক্যটি দ্যাখো :

She had a sister.

এটা অতীতকালেরই কথা, বোন আগে ছিল, এখন নেই, কিন্তু নীচের বাক্যতে অতীতকালের কোনো কথা নেই :

Milly wishes she had a sister.

মিলির বোন নেই, ছিলও না, কিন্তু থাকলে ভাল হত, এমন অবস্থায়, যা নয় সে-রকম কিছু হলে কী হত সে-কথা বলতে গেলে ক্রিয়াপদের অতীতকালের রূপ ব্যবহার করতে হয় : যেমন

I wish I hadn't written that.

It would be nice if she had a sister.

If he wrote down his wishes he would write that.

Milly wishes he didn't [know everything].

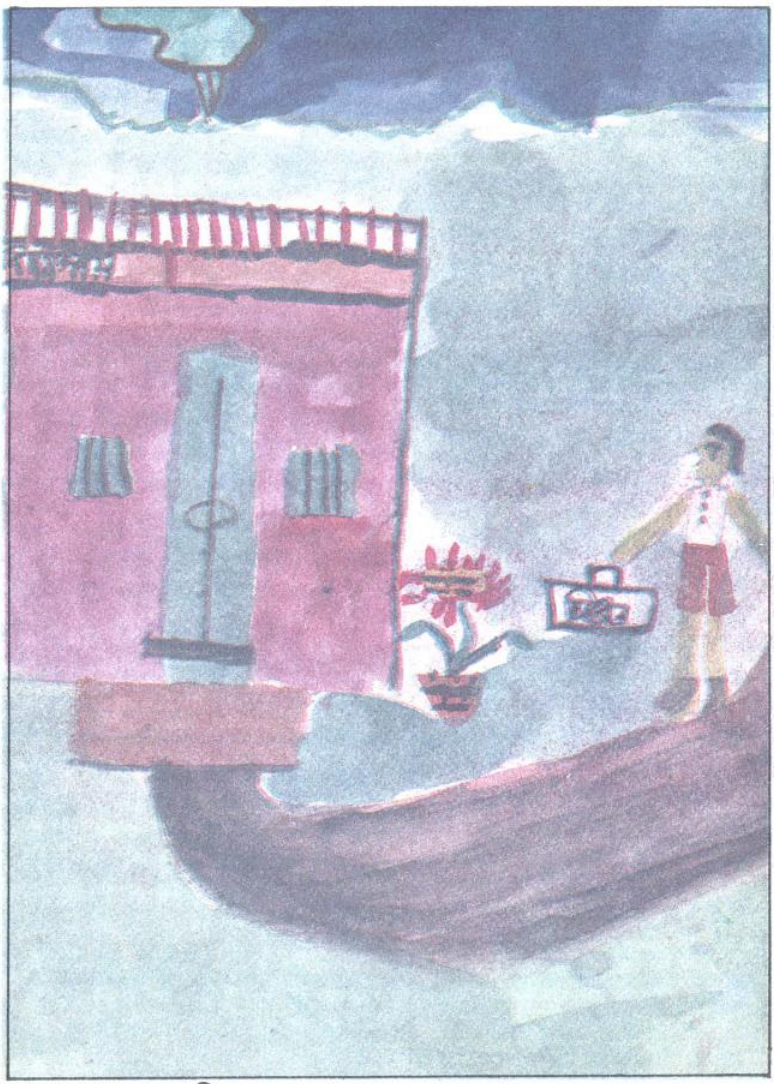

ছবি এঁকেছে **সুব্রত বিশ্বাস** (বয়স ৭)

ছবি এঁকেছে **অনির্বাণ দত্ত** (বয়স ৯)

ছবি এঁকেছে **দেবজিৎ ঘোষ** (বয়স ৯)

টিনটিনের দলবল

টিনটিন টিনটিন
কিবা তুমি খাও !
ক্যাপ্টেন শুধু বলে
ড্রিংক্‌স্‌ লে আও।
প্রফেসর ক্যালকুলাস
পেণ্ডুলামের সত্য দাস।
দুষ্টু স্নোয়ি বলে
আহা ! হাড্ডি কত চাও ?
জনসন ও রনসনের
হাতে লাঠির ভর
নতুন জুটেছে এক
নাম নেস্টর।

সঞ্জীব ইসলাম (বয়স ১৪)

জবর খবর

ফচকেমামার লংজাম্পে
ভীষণ ভাল নাম ছিল
টালা থেকে লাফ দিয়ে
ট্রম্বে গিয়ে থামছিল
তাই না শুনে খাঁদুপিসি
ভীষণ শীতে ঘামছিল
খবর শুনে সারা শহর
আফিঙেতে দম দিল

তাপস কুমার (বয়স ১৪)

আমার খেলাঘর

আমি লণ্ডন থেকে ফেরার সময় আমার পুরো খেলাঘরটি পিঠে করে বয়ে এনেছিলাম।

বাড়িতে এসে জমিয়ে খেলাঘর সাজিয়ে বসা হল। বড় পুতুলমেয়েটা আমারই জামা পরে, রিবন বাঁধে চুলে। আর মেজ মেয়েটা ছিল খুব দুষ্টু, মুখ থেকে চুষি কেড়ে নিলেই ককিয়ে কান্না শুরু করবে। আর একটা তো খুবই হ্যাংলা, সব সময় মুখে দুধের বোতল চাই। আর অন্যগুলো খুবই ছোট। শুইয়ে দিলেই ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম থেকে উঠে বসালেই তাকিয়ে দেখা চাই আমি কাছে আছি কি না।

সারাদিনই আমার খুব কাজ ওদের নিয়ে। কিন্তু এখন একটু মুশকিল হয়ে গেছে। আমি তো বড় হচ্ছি। ওরা কিছুতেই বড় হচ্ছে না। আমাকে স্কুল যেতে হচ্ছে। ওদের দেখাশুনা করার মতো সময় পাই না। সারাদিন স্কুল, নাচ, গান, ড্রইং কতরকম শিখতে হচ্ছে।

ওদের একটা কাঁচের আলমারিতে বসিয়ে রেখেছি। তাই ওদের খুব দুঃখ। মাঝে মাঝে ওদের কাছে এসে যখন দাঁড়াই তখন আমার ওদের সঙ্গে খেলার খুব ইচ্ছে হয়। কিন্তু কী করব ! আমি যে বড় হয়ে গেছি। আমার আর খেলার সময় নেই।

সুবর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় (বয়স ৮)

বাঘা-গাবলুদের গান-বাজনা

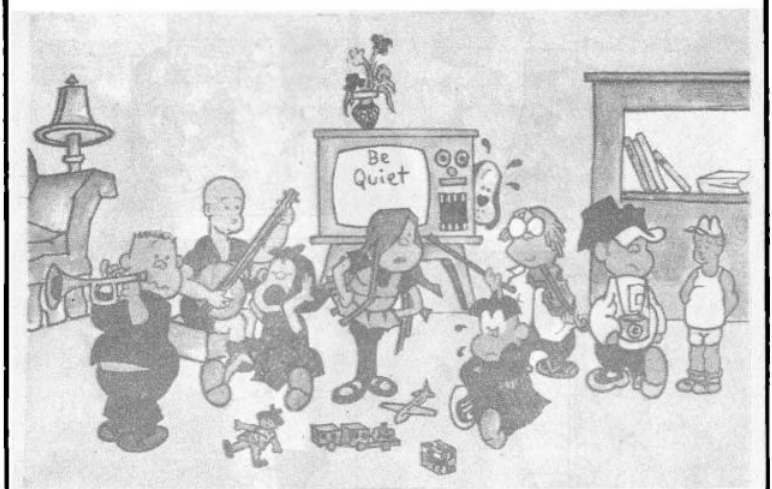

কয়েকদিন আগে 'আনন্দমেলা' পড়তে পড়তে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ কাদের চিৎকারে ঘুমটা ভেঙে গেল। তাকাতেই দেখি সামনে দাঁড়িয়ে আছে—বাঘা, গাবলু ইত্যাদিরা। বিস্ময়ের ঘোর কাটতে না কাটতে কুতুয়া এক লাফে বিছানায় উঠে এসে আমার মুখ চেটে দিল।

পরে জানতে পারলাম ওরা সকলে মিলে একটা গান-বাজনার ক্লাব খুলেছে। আমাকে ওদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে যে যার বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বসে গেল গান শোনাতে। একটু পরেই শুরু হল কান-ঝালাপালা-করা বিকট গান-বাজনা। ওই চিৎকার-চেঁচামেচিতে আমার মাথা তো ধরলই, এমনকী ঘরের আসবাবপত্রগুলো পর্যন্ত রেগে উঠল। শেষে ধৈর্যের বাঁধ ভাঙায় টিভিমশাই রেগে গিয়ে বলে উঠলেন, "বি কোয়ায়েট"। এই কথা শুনে আমি হো-হো করে হেসে উঠলাম। ঠিক তক্ষুনি সত্যি-সত্যি ঘুমটা ভেঙে গেল।

ছবি ও লেখা : **নীলেন্দু দে** (বয়স ১৫)

বাঘা

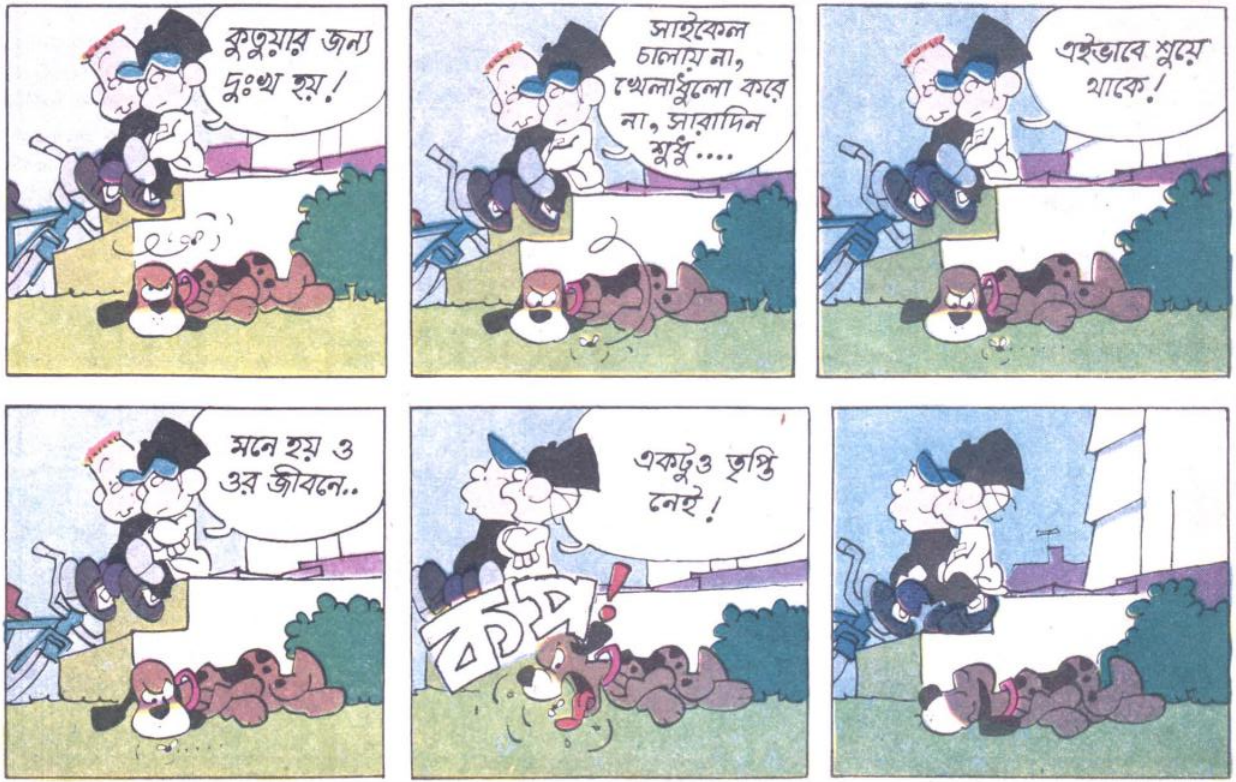

কুতুয়ার জন্য দুঃখ হয়!
সাইকেল চালায় না, খেলাধুলো করে না, সারাদিন শুধু ....
এইভাবে শুয়ে থাকে!
মনে হয় ও ওর জীবনে..
কপ্!
একটুও তৃপ্তি নেই!

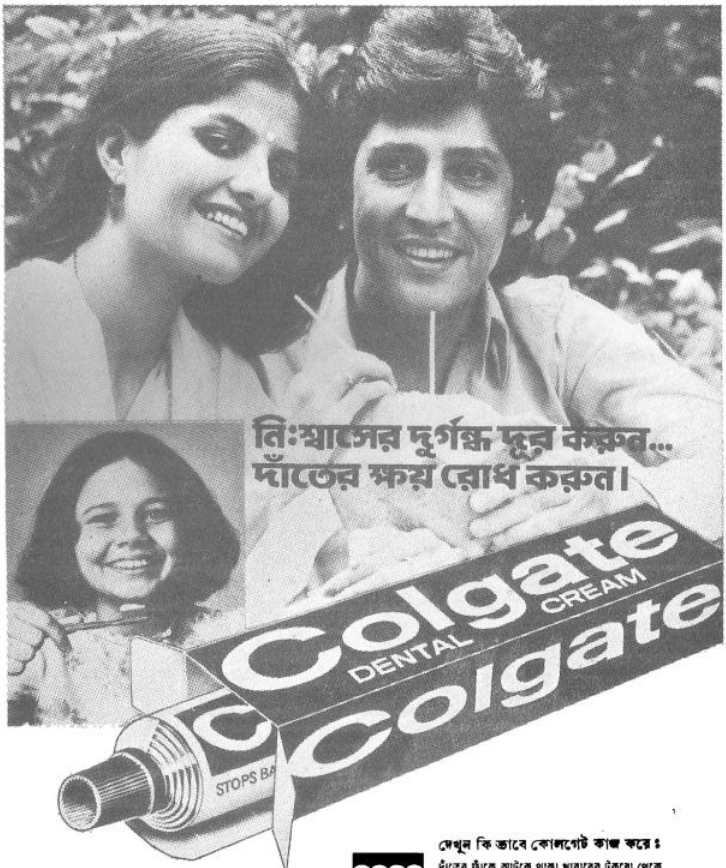

প্রতিবার দাঁত মাজার সময়
কোলগেটের নির্ভরযোগ্য
ফরমুলা আপনার শ্বাস-প্রশ্বাসকে
রাখে তাজা, নির্মল...
দাঁতকে রাখে শক্ত-মজবুত,
সুস্থ-সবল।

দেখুন কি ভাবে কোলগেট কাজ করে ঃ

দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাবারের টুকরো থেকে নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ ও দাঁতের ক্ষয়রোগের সৃষ্টি হয়।

কোলগেটের রাশি-রাশি ফেনা দাঁতের ফাঁকে ঢুকে এই ক্ষয় সৃষ্টিকারী খাবারের টুকরো ও রোগ জীবাণু দূর করে, দাঁতকে পরিষ্কার, ঝকমকে রাখে।

ফলাফল ঃ তাজা, নির্মল শ্বাস-প্রশ্বাস, ক্ষয় থেকে সুরক্ষা আর সুস্থ-সবল দাঁত।

প্রতিবার খাবার পরেই কোলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে দাঁত মাজতে ভুলবেন না। নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ দূরে রাখুন ... দাঁতের ক্ষয় রোধ করুন!

এর তাজা মিন্টি স্বাদ... সত্যিই চমৎকার!

GKGE 882 86 BN

পার্লে

মেলডি সগৌরবে ক'রল হাজির

গুফি আর প্লুটো

স্টিকার পাগলদের খপ্পরে.

তোমাদের প্রিয় ভিজনী বন্ধুদের ছবির স্টিকার... বিনামূল্যে !

শোন শোন ছোট্ট বন্ধুরা ! তোমাদের একান্ত প্রিয় ভিজনী বন্ধুদের স্টিকার এখন থেকেই জমাতে শুরু কর। সবশুদ্ধু ৩০-টা আছে। শোন কি করবে, মেলডি টফির ১০-টা র‍্যাপার আর নিজের নাম-ঠিকানা লেখা খামে ৫৫ পয়সার ডাকটিকিট লাগিয়ে আমাদের পাঠিয়ে দাও, ব্যস, একটা চমৎকার স্টিকার পেয়ে যাবে। এই ঠিকানায় পাঠাও :

মেলডি টফি, পার্লে প্রোডাক্টস প্রা.লি. নিরলন হাউস, ২৫৪-বি. ডঃ অ্যানী বেসান্ত রোড, বম্বে ৪০০ ০২৫।

নতুন পার্লে

মেলডি টফি

ক্যারামেল ও চকোলেটের মধুর মিলে চাকুম-চুকুম... খেতে কি দারুণ!

© WALT DISNEY INC. U.S.A.

everest/83/PP/314-bn